॥ प्रस्तावना ॥

॥ [illegible] ॥

নব জাগরণের প্রকৃতি ও বাংলা

ভারতবর্ষের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী এক অতি উজ্জ্বল সময় প্রবাহের স্রোতস্বিনী স্বরূপা । দেশ জননী তখন বিট্রিশ শক্তি দ্বারা আবদ্ধা । পরাধীনতা মানুষের মনে আনে স্বাধীনতার বাসনা । এই দাসত্ব মনোবৃত্তি হতে উদ্ভূত হয় জীবনের অন্য সকল মহত্তর চিত্ত বৃত্তির বীজ-প্রাণ ।

এই শতাব্দীতে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই সহজ সত্য ঘটনাই ঘটেছিল ।
"The most powerful effect and enduring result of the British rule in India is the intellectual development of the people on the entirely new line, and the consequent changes in their political, social, religious, and economic out look." ১

এই সময়েই মধ্য যুগের অন্ধ বিশ্বাসের আবর্তের পথ হতে আধুনিক যুগে রূপান্তর ঘটেছিল ভারতের । ভারতবর্ষের প্রায় সমগ্র অংশ পরাধীনতার বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল । দেশীয় রাজাদের ক্ষমতা ছিল সীমিত । ভারতবর্ষের ইংরাজ শাসণের সূত্রপাত ঘটেছিল বাংলাদেশে । বাংলা দেশে ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনার একটি বড় ফল ঘটেছিল - বাংলার মানসিকতা তথা মনস্বিতায় বিশাল পরিবর্তন ।

" The process of development followed more or less in the same line everywhere, but it is easier to trace it from begining to end more minutily and definitely in Bengal than in other province. ২

বাংলা তখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক তীর্থক্ষেত্র । বাংলা ভারতের রাজনৈতিক গুরু । যে আদর্শবাদের চেতনা দিয়ে বাংলা ভারতবর্ষকে প্রভাবান্বিত করেছিল তার সুন্দর ব্যাখ্যা পাই স্যার যদুনাথ সরকারের ভাষায় ,

If Pericles Athens was the school of Hellas, the eye of Greece, mother of arts and eloquence, that was Bengal to the west of India under British rule, but with a borrowed light which it had made its own with marvellous canning. In this new Bengal originated every good & great thing of the modern world that passed to the other provinces of India. New literary types, reform of the language, social reconstruction, political inspirations, religious movements and even changes in manners that originated in Bengal, passed like ripples from a central eddey, accross provincial barriers, to the furthest conners of India." ৩

ভারতবর্ষের সমগ্র পরিবেশ তখন বাংলার নিজস্ব চিন্তাধারা, মননশীলতার ঔদার্য্য, ধর্মীয় প্রবণতা, উদার প্রাণবন্ত রূপ, শিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী, সাহিত্য কীর্তির প্রোথিতযশা লেখকবৃন্দের মনোভাবনা, ও আর্থ সামাজিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের ভূমিকা, সংস্কারবাদী আন্দোলনের নব নব ঢেউ, গণচেতনার অভিব্যক্তির প্রদত্ত আলোকে উচ্ছ্বসিত ভারতচর্যও আপন সত্তাকে খুঁজে পেতে নিতে সাহায্য করছিল আপনার ভাবনায়।

উনবিংশ শতাব্দীর এই নব জাগরণের মধ্যেই লুকিয়েছিল ভারতীয় সাধনার ভবিষ্যত। রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক সকল বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশের প্রারম্ভ বিন্দু ছিল এই শতাব্দী।

'রেনেসাস' শব্দটির সাথে আমরা ইউরোপীয় ইতিহাসে ইটালির উজ্জ্বলতম দিকের কথা ভেবে ভারতীয় রেনেসাসের কথা অনেকের ধারণা মতো এই ক্ষেত্রে প্রযুক্ত করি। সুশোভন সরকারের মত লেখক মন্তব্য করছেন - " The impact of British rule, bourgeois economy and modern western culture was felt first in Bengal & produced an awakening known usually as the Bengal Renaissance. For about a Conturry, Bengal's

conscious awarness of the changing modern world was more developed than and ahead of that of the rest of India'. The role played by Bengal in modern awakening of India is thus comparable to the position occupied by Italy in the story of the European Renaissance". ৪

বাংলার এই জাগরণের প্রকৃতি বিচারের প্রশ্ন নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরেই গবেষকদের মধ্যে বিতর্ক চলে আসছে। বহু গবেষকই এই জাগরণের ইতিবাচক দিকটি প্রকাশিত করেছেন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই। কিন্তু কিছু মনস্বিতা এই ব্যাঞ্জনায় ভিন্ন সুর লক্ষ্য করেছেন। " অষ্টাদশ শতকের শেষ দশক গুলোতে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক দশক গুলোতে বাংলা দেশে যা সংঘটিত হয়েছিল তা হল, গুনগত বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র প্রাচ্যের একটি সভ্যতার উপর পাশ্চাত্যের একটি গতিশীল সভ্যতার অভিঘাত, ঐ প্রাচ্য সভ্যতাটিকে যদি মৃত না-ও বলা যায় বলতেই হয় জড় ও গতিহারা। এই অভিঘাত ছিল আগ্রাসনের, সাময়িক বিজয়ের অবশ্যম্ভাবী অচ্ছেদ্য ফলশ্রুতি। পরিশেষে, তা এমন এক অভাবনীয় সাড়া জাগিয়ে তোলে এমন এক আশ্চর্য্য গতি ও প্রগতির পথ ধরিয়ে দেয় যা নাকি প্রাচ্য সমাজের রূপান্তরের নিয়ম, নিস্তব্ধ প্রশান্ত জীবন পদ্ধতি, কোন দিক থেকেই চিহ্নিত বা অবধারিত ছিল না। ..... এই সমাজেই পাশ্চাত্যের আগ্রাসনের ফলে অকস্মাৎ তার চিরস্থির ঐতিহ্যের আশ্রয় থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়, জীবনের নিরুপদ্রব প্রবাহ বিঘ্নিত হয়। মানবিক ভুবন হয় বিপর্যস্ত। এই আবর্তে এবং শ্বেতচর্মী আগন্তুকের আধিপত্যের নিরন্তর সচেতনতা থেকে আসে অনিবার্য সাড়া, যা রেনেসাঁস অভিধায় আখ্যাত।" ৫

ইউরোপীয় নবজাগরণের সূত্রপাত চতুর্দশ শতাব্দীতে। ক্ষেত্র ইটালি। শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতি, ভাবনা ও চিন্তায় ইতালি তখনও ইউরোপের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাই সেখানেই জাগরণের অনুকূল পরিবেশ দেখা গিয়েছিল। এই জাগরণের স্বরূপ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে সিমন্ডস বলছেন - " By the term Renaissance, or new birth, is indicated a natural movement, not to be explained by this or that characteristic, but to be accepted as an effort

humanity for which at length the time had come and in the onward progress of which we still participate .....
It is the history of the attainment of self conscious freedom to the human spirit manifested in the European races. It is no more a political mutation, no new fashion of art, no restoration of classical standard of taste. The arts and the inventions, the knowledge and the books, which suddenly became vital at the time of the Renaissance, had long been neglected on the shores of the Dead Sea, which we call the middle Ages. It was not their discovery which the Renaissance, but it was the intellectual energy, the spontaneous burst of inteligence, which enabled mankind at the moment to make use of them. The force then generated still continued, vital and expansive in the spirit of the modern world." ৬

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার জাগরণও এক রেনেসাঁস। প্রত্যেক দেশের চিন্তার চেতনায় রূপ অনুসারে নবজাগরণেরও একটি স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির গতিপথ আছে। তাই আমাদের বঙ্গের এই জাগরণের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আছে, আছে নিজস্ব সুষমা। বাঙালীর জাতীয় মানসের এক বিশিষ্ট্য চরিত্র অনুযায়ী এক অপূর্ব সুন্দর স্বতন্ত্র রসমূর্তি পরিগ্রহ করে বাংলার সমাজ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, চিন্তা ও চৈতন্যের পরিপ্রেক্ষিতে এর আত্ম প্রকাশ ঘটেছিল এবং সেই দৃষ্টিকোন থেকে এই জাগরণের বিশ্লেষণই শ্রেয়।

ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন

এই নবজাগরণের মূলে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল , কিন্তু প্রতীচ্যের ভাব ও চিন্তাধারার প্রভাব ছিল অধিক মাত্রায় প্রখর । ধর্ম সাহিত্য , শিক্ষা , সমাজ ও রাজনীতি এক কথায় জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে এবং সর্বস্তরে ভাবুক কল্পনা বিলাসী ও ভক্তি প্রবণ বাঙালীর চরিত্রানুসারে তার মানস লোকে ভাবাদর্শের যে নূতন বন্যা উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল , তার তুলনায় বাস্তব জীবনের পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র । সুশীল গুপ্তের মতে " এই পরিবর্তনও অনেক বিষয়ে যতটা ব্যক্তি ও আদর্শগত ততটা সমাজগত নহে । " ৭

মানুষ যতই বুদ্ধিজীবী যুক্তিবাদী হোক না কেন , প্রাচীন ঐতিহ্য ও প্রাধিকারীর উপরে তার আছে এক দুর্নিবার আকর্ষন , শ্রদ্ধা ও মোহ । মানুষ চায় তার আবিষ্কার বিচার ও যুক্তিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের দৃষ্টিকোন হতে সমীক্ষা করতে । অতীতের নানা উত্থান পতন ও ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে এক অম্লান সুস্থির জীবন ভাব ও আদর্শের সন্ধান করা তার জন্মগত বাসনা । আর এই জন্যই ইউরোপের জাগরণের সময়ে ক্লাসিকাল যুগের সাহিত্য শিক্ষা ও জীবনের অনুসন্ধানের মূলবোধের খোঁজে তারা ওতপ্রোত ভাবে নিয়োজিত ছিল । ঠিক এই সময়েও বাংলায় দেখা দিয়েছিল এই তীব্র অনুসন্ধানী মনোবৃত্তি । বাংলার নবজাগরণ ছিল পাশ্চাত্যের মোহ আবদ্ধ সাংস্কৃতির আদর্শ বোধের তরঙ্গায়িত ধারায় নিজস্ব প্রাচীন ঐতিহ্যের চেতনার প্রাণ সম্পদ গুলোকে খুঁজে বার করে চৈতন্যের আনন্দলোকে দীপ্যমান হওয়া । এতে ছিল প্রাচীনের প্রতি আস্থিতা । অন্ধ তামসিক পূর্ণ মনোভাবনা নয় । গতিশীল সমাজ জীবনের প্রয়োজনে পরিশীলিত মনোবৃত্তি ।

তাই আধুনিক শিক্ষায় অনুরাগী ব্যক্তির মুখেও এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই " In the broad family of peoples which constitute India, the recognition of the distinctiveness of the Bengalis

has been in modern times largely bound up with the appreciation of this flowering of social, religious, literary and political activities in Bengal. And today when disintegration threatens every aspect of our life, it is more necessary than ever to recall our past heritage, to go over again the struggles and achievements which had built up a proud tradition, now in danger of being forgotten".

নব জাগরণের কাল খণ্ডে রামমোহন ও তাঁর সঙ্গীগণ

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা যখন নব জাগরণে উদ্দীপ্ত হচ্ছিল , তার সুবর্ণময় শহর কেন্দ্রিক পটভূমি রচনা করেছিল কলিকাতা । ১৬৯০ সালের প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা ও রামমোহনের ১৮১৫ সালে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস এই দুই সময়ের ব্যবধানে কলিকাতা ছিল সম্পূর্ণ ভাবে ভিন্ন নগরী ।

কলিকাতার নগর জীবনে তখন একদিকে প্রবল পশ্চিমী হাওয়া । পাশ্চাত্য দর্শনের ঝলকে কলিকাতা উদ্বেল । [illegible] জীবনচর্চার এমন সহজ লব্ধ উপকরণের প্রাচুর্য্য শুধু বাংলায় কেন ভারতবর্ষের অন্যত্র কোথাও ছিল না । ইন্দ্রিয় সংবেদ্য জীবনের প্রয়োজনীয় সব সম্ভারই কলিকাতায় বর্তমান ছিল । আবার কলকাতায় ছিল প্রগতিশীল ও সর্বাধুনিক ইউরোপীয় চিন্তার কেন্দ্রস্থল । অপর পক্ষে এখানেই ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলনের আবেদন প্রথম উচ্চারিত হয়েছে ।

প্রথমে রামমোহন , পরে বিদ্যাসাগর সমাজ জীবনে গতি সঞ্চার করতে সমর্থ

হয়েছিলেন । ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নির্বাধ কেন্দ্র , বুদ্ধিমার্গীয় ঘাত - সংঘাত ইত্যাদি আলোড়নের অন্তরালে কলিকাতাতেই ছিল ধনসম্পদের আভিজাত্য ও চিন্তা মননের আভিজাত্য ।

রামমোহন এই কলকাতায় স্থায়ী ভাবে আসন পাতলেন ১৮১৫ সালে। ১৮৩৩ এ তাঁর মৃত্যু । উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে এই কাল খন্ড রামমোহনের যুগ । ঐ সময়ে কলিকাতা তাঁর চিন্তা , মনন , কর্মে ও ব্যক্তিত্ব বোধের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল ।

রামমোহনের কালেই পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য দুই ভিন্ন ধর্মী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংঘাত হতে উদ্ভূত সামাজিক আবর্তের কলেবর এক নতুন রূপ ধারণ করে । ইংরেজ রাজপুরুষ পরিব্রাজক শিক্ষক পাদ্রী প্রভৃতির মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের যুক্তি ধর্মী মনন বোধ ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে ভারতীয় মনকে প্রবল ভাবে নাড়া দেয় । আর ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে ওদের প্রেয়োবাদ প্রাচ্যের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে তোলে ।

এর শুভ পরিনতি হয়েছে বাংলার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বিন্দুর দ্রুত বিচলনে । ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল থেকেই কলকাতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামোয় মুখ্য ভূমিকার আসনে স্থিত ছিল । তা ছাড়া সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা , এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা এবং এর মাধ্যমে ঐশ্বর্যশীল সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনের কার্য্যক্রম গ্রহণ , ইংরেজ ভাষাবিদদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন এই সকল যুগান্তকারী ঘটনায় কলকাতার সাংস্কৃতিক মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় । এই পর্ব বা কাল খন্ডে বাংলার জাগরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যুগধর্মকে আকণ্ঠ পান করার প্রবণতা ; আধুনিকতার কাল স্রোতে অবগাহন করার এক দুর্দমনীয় আগ্রহ । যুক্তির পরীক্ষায় , বিজ্ঞানের পরীক্ষায় যা সিদ্ধ শুধু তাকেই গ্রহণ করার আকাঙ্খা । এই যুগ ধর্মের কষ্টি পাথরে তাঁরা প্রচলিত সামন্ত তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিটি অনুশাসনকে যাচাই করায় আগ্রহী ছিল । অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কারের প্রতি তারা প্রচন্ড আঘাত

হানতে চাইলেন। এই সময়েই রামমোহন কলকাতায় এলেন।

Miss Collect রামমোহন সম্পর্কে এই সময় লিখেছেন "He was now in the Prime of manhood. A majestic man, nearly six feet in hight and remarkable for his dignity of bearing and grace of manner, as will as for his handsome countenance and sparking eyes. Thick clouds of ignorance and supertition hung over All the land, the native Bengali public had few books and no news propers. Idolatry was universal, and was often a most revolting character ; polygomey and infantacide were widely prevalent and the lot of Bengali world was too often a tissue of ceaseless oppressions and misseries, while as the crowaing horror the flames of the Suttee was lighted with almost in credible frequency even is the immediate vicinity of Calcutta. He did not however, confine his activity to use or two subjects. His alert and eager mind ranged with keen interest over the whole field of contemporary life, and on almost every branch there of the left the previous of his individuality. Alike religion, politics, literature & philosophy his labours, will be found among the earlist and most effective in history of native Indian reform". ৭

রামমোহনের জন্ম শত বার্ষিকী উপলক্ষে ভাষণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে ভারতের আধুনিক যুগের উদ্গাতা বলে উল্লেখ করেছেন। "Rammohan was the only person in his time, in the whole world of man, to

realize completely the significance of the Modern Age of India. ১০

রামমোহন ছিলেন মানবত্তার পূজারী কিন্তু সেই মানবিকতা খন্ডিত নয়। দেশের জাতির সংকীর্ণ সীমা রেখায় আবদ্ধ নয়। মানবত্তাকে তিনি তাঁর সমগ্রতায় বিশ্বব্যাপী পরিসরে অবলোকন করেছেন। তাই মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তকে ভেদ করে ইউরোপে নতুন ভাব ধারার দূর্বার জয়যাত্রা তাকে অভিভূত করেছে।

ইউরোপের দুই যুগান্তকারী আন্দোলন - আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ফরাসী বিপ্লব তাঁর মনকে ভীষণ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। মানব স্বাধীনতার উৎস - ভূমি ইউরোপের ভাষা সাহিত্য দর্শন গভীর ভাবে অনুশীলন করার আর ইউরোপের এই জ্ঞান দীপ্তিকে হৃদয়ে গ্রহণ করার আকাঙ্খা তাঁর প্রবল ছিল। রামমোহন ইউরোপকে খ্রীষ্টীয় সভ্যতার ভিত্তিভূমি হিসেবে না দেখে তিনি দেখেছিলেন এর বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিকে।

ইউরোপের এক নতুন মুক্ত মনের চিন্তার জনক যাঁরা — বেকন, নিউটন, টম পেইন, হিউম, বেন্থাম, লক, ভলতেয়ার — এঁদের চিন্তাধারার প্রভাব তাঁর উপর ছিল। পাশ্চাত্যের এই যুক্তিবাদী প্রগতিশীল চিন্তা ধারায় অবগাহন করেই রামমোহন এদেশের পুঞ্জীভূত কুসংস্কার, মধ্যযুগীয় অন্ধ অনুশাসন, জাতিভেদ, কৌলীন্য প্রথা, নারী নির্যাতন, সতীদাহর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত করলেন। আবার বিশ্বের রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে যখন অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিজয় ঘোষিত হয়েছে, তাতে তিনি আনন্দিত হয়েছেন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নির্দয় বেড়াজালে যখন কোন মুক্ত আবদ্ধ তখন তিনি হোন ব্যথিত। বিশ্বের সঙ্গে এই আত্মীয় বোধ — রবীন্দ্রনাথ তাকেই আধুনিক মনের বড় বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকার

করেছেন । সেই দৃষ্টি কোনের জন্যই উনিশ শতকের প্রথম পর্বে ফ্রান্স , স্পেন , নেপলস , পর্তুগাল , ইতালি , জার্মানী প্রভৃতি দেশে যেখানেই গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছিল রামমোহন তাদেরই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন । ১৮৩০ এর ফরাসী বিপ্লবের সাফল্যকে তিনি স্বাধীনতার আদর্শের সাফল্য বলে মনে করেছেন ।

রামমোহন যুক্তিবাদী সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । তাঁর একেশ্বর বাদের মধ্যে লৌকিক কল্যাণ চিন্তাই মুখ্য ছিল । তিনি বলতেন জাতির উন্নতি করতে হলে প্রত্যক্ষ বা বাস্তবকে স্বীকার করে মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধির আরাধনা করতে হবে শক্তির সঞ্চয় করতে হবে । জাতির প্রতি তাঁর তীব্র ভালবাসা তাঁকে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে প্রেরণা দিয়েছিল । সামাজিক অন্যায় অবিচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রামমোহনের একক সংগ্রাম দেশবাসীর মনে এক দৃঢ় আত্ম প্রত্যয় গড়ে তুলেছিল । ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় সংবাদ পত্রের উপর নানা প্রকার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলে রামমোহন তাঁর ফারসি পত্রিকা ' মিরাত উলআকবর ' বন্ধ করে দেন এবং এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন " হৃদয়ের অজস্র রক্ত বিন্দুর বিনিময়ে যে মর্যাদা অর্জন করেছ সামান্য খুদ কুঁড়োর আশায় তুমি তা একজন মূঢ়ের দয়ার নিকট বিকিয়ে দিও না !" ইংরেজ শাসনতন্ত্রে ইংরেজ নির্ভরতার দিনে এ এক নতুন কণ্ঠ স্বর । আর এই স্বাধীনতা প্রেমিক কণ্ঠই একদিন ঘোষণা করেছিল " স্বাধীনতার শত্রু এবং স্বৈরাচারের মিত্ররা শেষ পর্যন্ত কোনদিন জয়লাভ করেনি , করবে নাও কখনও ।" রামমোহন ব্রিটিশ শাসনকে চিরন্তন বলে মনে করেননি । " অসংখ্য অভিনব পরিবর্তনের আবর্তে তিনি স্থৈর্য্য হারাননি , কারণ তার সংস্কৃতির মূল ছিল দেশের মাটিতে প্রোথিত ।" ১১

রামমোহনের মৃত্যুর পর যে ব্রাহ্ম সমাজ প্রভাব বিস্তার করেছিল রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজের সাথে তার যথেষ্ট পার্থক্য আছে । রামমোহন চির জীবনের সকল সাধনার সম্পদ তাঁর ব্রাহ্মোপসনা । এই ব্রাহ্মোপসনাকে তিনি সমাজে এক সুসংহত রূপ দিয়েছিলেন ।

নতুন চিন্তাধারায় ভাবনায় সম্পৃক্ত হয়ে রামমোহন মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারণার গ্রন্থি গুলোর উপর আঘাত হানলেন । বেদান্ত বাদের অনুশীলন তাকে প্রেরণা দিয়েছিল ভারতীয় সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার । তাই তিনি জাতি ভেদ প্রথার বিরোধিতা করেছেন । ১৮২৭'এ তিনি ' বজ্রসূচী ' অনুবাদ করেন যে গ্রন্থ বর্ণভেদে ব্যবহার তার তীব্র সমালোচনা করেছেন । ১৮২৮' এ তিনি এক চিঠিতে বললেন জাতিভেদ প্রথা জনগণকে তার দেশাত্ম বোধ হতে দূরে কমে রাখছে।সেইজন্য ধর্মীয় সংস্কারের আশু প্রয়োজন যার মাধ্যমে মানুষ রাজনৈতিক চিন্তার প্রসারতা ও সামাজিক সুবিধা পাবে । তিনি ব্রিটিশ রাজত্বের পর স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখতেন । তিনি অনুভব করেছিলেন ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত শ্রেনীর উদ্ভব ঘটেছে । একদিন এই মধ্যবিত্ত শ্রেনীই ভারতের মুক্তি আন্দোলনের পথ দেখাবে । "Again & again there fitted across his vision the prospect of a free India, after a period of the British tutelage, and he expressed this view is an interview with Frenchman, Jacquemont, is a discussion with standford Merton in a letter on 18 August 1828 to crowford. He felt that English rule was creating a middle class in India which would lead a popular movement of Emancipation".[১৩] (On the Bengal Renaissance- Susobhan Sarkar P-80)

১৮৩৩' এ রাম মোহনের মৃত্যু ঘটল । গোড়া পন্থীদের তীব্র আক্রমণ সত্ত্বেও রামমোহন রেখে গেলেন এক উদার নৈতিক পরিমন্ডলে স্বাধীন চিন্তাধারা । সমাজ তথা দেশবাসীকে জীবন্ত অনুভূতির উপর স্থাপন করলেন । শিক্ষা , সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের পথ ধরেই যে স্বাধীনতার আন্দোলনের ক্ষেত্র ভূমি প্রতিষ্ঠা করবে , এই দৃপ্ত মানুষটি নিজের জীবন দিয়ে এই সহজ সত্যকে প্রকাশিত করেছেন । তাই রামমোহনের অনুপস্থিতি তাঁর দীপ্ত আদর্শ বোধের প্রাজ্জল প্রবাহ এক দিকে যেমন দেশবাসীকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তেমন ভাবে অন্যদিকে রেখে গিয়েছিল তারই আদর্শ বোধে উদ্দীপ্ত উত্তর সূরীর দল , যাঁরা রামমোহনকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন । রামমোহনের

অবদান – তিনি ভারতীয় মানসিকতায় মুক্ত প্রবাহ এনে দিয়েছিলেন তাই পরবর্তীতে বাংলার তথা ভারতের মাটিতে অত্যন্ত স্বচ্ছ ভাবে নিজেকে বিকাশ করার সুযোগ পেয়েছিল ভারতবাসী ।

রামোহন বাংলা সাহিত্য প্রসার করলেন । ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের সাথে ও দেশীয় পন্ডিতদের সাথে তাঁর তর্ক বিতর্ক বাংলা গদ্যের বিকাশ ঘটাল । চিন্তার প্রাঞ্জল সাবলীলতার মতো তার ভাষা ছিল সহজ ও ঋজু । ভারতীয় চেতনার মানসিকতা ভাষার মাধ্যমেই প্রকাশ করলেন । এ যেন এক মুক্ত মনের প্রতিষ্ঠা ভূমির সৃষ্টি হল তাঁর সাহিত্যবাদ থেকে । এই মুক্ত মনই পরবর্তীতে জন্ম দিল জাতীয়তাবাদের ।

রামমোহন চলে গেলেন ১৮৩৩ এ । তাঁর অনুগামীরা ছিলেন দ্বারকা নাথ ঠাকুর , রমানাথ ঠাকুর , প্রসন্ন কুমার ঠাকুর , কৃষ্ণ মোহন মজুমদার , ব্রজ মোহন মজুমদার , কালীনাথ মুন্সী , চন্দ্রশেখর দেব , তারাচাঁদ চক্রবর্তী , নন্দকিশোর বসু , রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি । রামমোহন প্রবর্তিত নব সংস্কার আন্দোলনে তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থা ও অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সঙ্গী ছিলেন এঁরা । ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ না করে বরং এই শাসনের আওতায় থেকে স্বাধিকার অর্জন করা , সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা , সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে অন্তরায় সামন্ততান্ত্রিক কু - শাসন গুলো পরিহার করা এই ছিল রামমোহনীয় অনুগামীদের মানসিক চিন্তা ।

ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী

এই রামমোহনীয় যুগে দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজ গঠনের আহ্বান জানিয়েছিল এক দল অতি উৎসাহী যুবক বৃন্দ । ' ইয়ং বেঙ্গল ' বলে তারা খ্যাত । হেনরী লুইস ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিল এদের নেতা । ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে সতের বৎসর বয়সে সর্ব -

সংস্কার মুক্ত যুক্তিবাদী , দার্শনিক , স্বাধীন চিন্তার উপাসক ডিরোজিও হিন্দু কলেজে শিক্ষক রূপে যোগ দেন । ডিরোজিও বাংলার সামাজিক ভিত্তিকে প্রচন্ড ভাবে নাড়া দিয়েছিলেন। শাসন সামাজিক সংস্কার থেকে আরম্ভ করে , স্বদেশ প্রীতি ব্যক্তি স্বাধীনতা , স্ত্রী শিক্ষা , ঈশ্বরের অস্তিত্ব , প্রতিমা পূজা , পুরোহিত সম্প্রদায় , পাপপুণ্য , অদৃষ্টবাদ ইত্যাদি সর্ব বিষয়েই স্বাধীন যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সর্ব প্রকার সংস্কার মুক্ত প্রাঞ্জল দৃষ্টি ধারায় তিনি ছাত্রদের উৎসাহিত করেছেন ।

হিন্দু কলেজের এই শিক্ষা গুরু ডিরোজিওকে পেইন , হিউম , গিবন প্রভৃতির চিন্তাধারা তাঁকে সংশয় বাদী করে তুলেছিল । তিনি রামমোহনের আস্তিকতার গন্ডীকে নির্দিষ্ট বলে মেনে নিতে পারেননি । তিনি বলতেন আস্তিকতা , নাস্তিকতা বিচার সাপেক্ষ ।

তিনি স্বাধীনতার মন্ত্রে তরুণ ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করেছেন । অনৈতিক থেকে আরম্ভ করে সকল প্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তরুণ সমাজকে উৎসাহিত করেছেন আর অন্য দিকে ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের পরাধীনতার জ্বালা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন । দেশ প্রেমের চেতনা , পরাধীন ভারতের বেদনা আর বৈভবময় স্বাধীন ভারতের কামণায় তাঁর মানসিকতার এক অপূর্ব উত্তরণ ঘটেছে । তাঁরই লেখা - 'The Harp of India', To India my Native Land, Independance' প্রভৃতি কবিতায় তাঁর চিন্তার মর্মবাণী গ্রথিত আছে ।

'To India my Native Land ' কবিতায় শৃঙ্খলিত ভারতের প্রতি কবির কি অপূর্ব মমত্ব বোধ জাগরিত হয়েছে —

My country, in they day of glory past
A beautious halo circled round thy brow,
And Worshipped as a diety thou wast
Where is that glory, where that reverence now ?

Independence কবিতায় তাঁর বিদ্রোহী আত্মা বলদর্পী ইংরাজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। তিনি জানতেন শক্তির কবল থেকে একদিন স্বাধীনতার প্রদীপ জ্বলবেই।

'Look on that lamp which seems to glide
Like a spirit O'er the stream
Casting upon the darkened tide
Its own mysterious beams'.

ইউরোপীয় সমাজের পক্ষ হতে সম মর্যাদার দাবিকরে সেই সময়ে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, ডিরোজিও ছিলেন তার পুরোভাগে। কারণ তিনি বলেছিলেন —
' I love my country and I love justice, be therefore, I ought to be here'.

ডিরোজিওর বস্তুবাদী ভাবধারা, প্রগতিশীল জীবন দর্শন, দেশ প্রেমের ভাবনা হিন্দু কলেজে ইংরেজ ও দেশীয় কর্তৃপক্ষের একাংশ পছন্দ করেননি। কারণ তাঁরা শুধু দেশীয় সামন্ততান্ত্রিক অনুশাসনের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেননি। তাঁরা খ্রীষ্টান পাদরীদের গোঁড়ামি ও সহ্য করতেন না। পাদরী ডাফতাই এঁদের উপর বিরক্ত হয়ে লিখেছেন " এঁদের মতে খ্রীষ্ট ধর্ম হল কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখতে এক উন্নততর চেষ্টা মাত্র। তাদের চোখে পাদরীরা ছিলেন ধূর্ত দূষমন অথবা অশিক্ষিত গোঁড়ার দল। তারা পাদরীদের ইউরোপের ব্রাহ্মণ বলে ঠাট্টা করতেন। " ১৪ ফলে তিনি বিতাড়িত হয়েছিলেন হিন্দু কলেজ থেকে।

ডিরোজিও নিজে ছিলেন ইউরোপের বস্তুবাদী জীবন দর্শনে বিশ্বাসী। অষ্টাদশ

শতাব্দীর বিপ্লবী ইউরোপের হিউম পুরোহিততন্ত্র , রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রকে আঘাত করেছিলেন । হিউমের আদর্শে দীক্ষিত ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ও যুক্তিবাদকে আশ্রয় করে ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন । এই নব্য গোষ্ঠীর কাছে টম - পেইন' এর 'Age of Reason' বিশেষ আদৃত ছিল । আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ফরাসী বিপ্লবকে পেইন' এর চিন্তাধারা বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল । প্রচলিত ধর্মব্যবস্থা যা ছিল স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের সহায়ক তার বিরুদ্ধেও পেইনের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল । পেইন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দ্বিধাহীন নির্লজ্জ শোষণকে মেনে নেননি । তিনি মন্তব্য করছেন - "For the domestic happiness of British the peace of the world, I wish she had not a foot of land but what is circums_cribed within her own island. Extent of dominion has been her ruin and instead of civilizing others has brutalized herself." এ হচ্ছে তাঁর [illegible] ।

তাই এদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে Bengal Spectator । বৈষম্য মূলক কালা কানুনের বিরোধিতা এঁরাই করেছেন । ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার আইনের অগনতান্ত্রিক ধারাগুলোর এঁরা সমালোচনায় সমালোচিত করেছেন । এই ডিরোজিয়ানরা ডিরোজিওর পরও আন্দোলন চালিয়ে গেছেন , এঁদের মধ্যে ছিলেন রাম গোপাল ঘোষ , রসিক কৃষ্ণ মল্লিক , দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় , রামতনু লাহিড়ী , দক্ষিণা রঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ ।

এই যুগে দক্ষিণা রঞ্জন বলেছেন " ভারতের দারিদ্র্যের কারণ তার পরাধীনতা " । ১৫ রাম গোপাল ঘোষ বলেছেন " আমাদের মতো দেশে এবং আমাদের মতো সরকারের অধীনে ভারত বাসীর যোগ্যতা ও মৌলিকতা যে যথাযোগ্য পুরস্কার পাবেনা — এ তো জানা কথা । আমাদের দেশ স্বাধীন নয় । তাছাড়া আমাদের সরকারও দেশের জনমতের প্রতিনিধিত্ব করে না । " ১৬

119343
4 NOV 1997
University Library

কিন্তু এই ডিরোজিওদের হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা , সমাজের আচার পদ্ধতির প্রতি বিতৃষ্ণা , ভাবনা ও কার্য্য কলাপে উগ্রতা বোধের জন্য তাদের এই নব্য বঙ্গ আন্দোলন এমে স্তিমিত হয়ে এল । এই আন্দোলন সমাজ মুখী হলো না ।

ফলে " ডিরোজিওর বহু শিষ্য স্থৈর্য্য হারিয়েছিলেন এবং ঝুঁকে পড়েছিলেন বিপ্লবী ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেনীর রোম্যান্টিক ব্যক্তিবাদের দিকে , হিউমের সংশয় বাদের দিকে , রুশো ও পেইনের সম্য ভাবনার দিকে । হিন্দু শাস্ত্র তাঁদের চোখে অযৌক্তিক ও যুগ ধর্ম বিরোধী , হিন্দু দেব দেবী অধঃপতিত অতীতের প্রতীক , হিন্দু নীতি ও আচার — অমানবিক ও অবাস্তব । ডিরোজিওর ব্যক্তিগত নীতির ভিত্তি (ধর্ম ও দর্শন) গুরু বা শিষ্য কারুরই দৃষ্টি দোলাচল , পরিবার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার বিপরীত টানে পঙ্গু , দেশের রাজনীতিতে অবহেলিত ও অর্থনীতিতে অপাংক্তেয় , বিদ্রোহী এই তরুণের দল মূল্যহীনতার প্রতিক্রিয়ায় , বিচ্ছিন্নতা বোধের দুঃখে আশ্রয় নিলেন পশ্চিমের বাহ্যিক অনুকরণে । " ১৭

"The flutter caused in Bengal society by the Derozians was, however, is the perspective of history something ephemeral and unsubtantial. They failed to develop my movement outside their own charmed circle and the circle it self could hardly keep any significant form". ১৮

এত এটি থাকা সত্ত্বেও তখনকার ঐতিহাসিক অবস্থার পরিবেশে ইয়ং বেঙ্গল জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক চেতনার ধারার আকাশে এক ঝলক চোখ ধাঁধানো বিদ্যুৎ শিখা — যা মুহূর্তে আলোকিত করে ম্লান হয়ে যায় শুধু রেখে যায় তার আলোড়ন টুকু । এটাই বা মানসিক চিন্তাধারার বিবর্তনে কম কিসের ?

বিদ্যাসাগর ও তাঁর সংস্কার ক্ষেত্র

" আলবিয়নের মোহিনী কণ্ঠে মুগ্ধ ঘর ছাড়া তরুণের দল একদিন প্রবীন হল। আপন ঘরে ফিরতে চাইল। তারা দেখল মফস্বলের দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান বিদ্যাসাগর, সংস্কৃত শিক্ষিত বিদ্যাসাগর, শুধু অজেয় পৌরুষ ও অক্ষয় দ্বারা ঐতিহ্যকে কত সার্থক ভাবে আধুনিকী করণেকাজে লাগিয়ে ছিলেন।" ১১

রামমোহন ও ডিরোজিও পন্থীরা যখন ইংরাজী ভাষার মুখ্য প্রবক্তা, বিদ্যসাগর তখন নিরবে মাতৃভাষার সাধনার অঙ্গনে সবাইকে আহ্বান করছেন। এখানেই তাঁর বিবেক, কালচেতনা ও ব্যবহারিক বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যদিও তিনি ইংরাজী চর্চাকে ছাত্রদের মানস পরিমন্ডল পরিশুদ্ধ করার হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করতে চেয়েছেন তবুও তাঁর ব্যবহারিক বোধ তাঁকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করেছিল যে ইংরাজীকে দূরবর্তী পল্লীর প্রান্তে নিয়ে যাওয়া এক অবাস্তব প্রস্তাব। তাছাড়া পাশ্চাত্যের যুক্তি - বাদী মনন ও মূল্য বোধের বাহন বা মাধ্যম ইংরাজী হতে পারেনা। হবে মাতৃভাষা।

এই দৃষ্টি কোন থেকেই তাঁর অন্তকরণে প্রতিভাত হয়েছিল শিক্ষা বিস্তারের আগ্রহ। তাই তিনি বাংলা স্কুল খোলার জন্য অত্যধিক আকুতি দেখিয়েছিলেন। সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যম ও প্রচন্ড শ্রম সহিষ্ণুতা যুক্ত হয়ে বিভিন্ন জেলায় বাংলা মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পাশা পাশি ছিল তাঁর স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচীর রূপায়ন। বিদ্যাসাগর চেয়ে ছিলেন শিক্ষার মাধ্যমেই অচল সমাজে গতি সঞ্চার করতে। বিদ্যাসাগরের এই শিক্ষা বিস্তারের কার্যকলাপে পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথও মুগ্ধ হয়ে অনুভব করেছিলেন — মনের চলাচল যত বড় হয় দেশের পরিধিও তত বড়।

বিদ্যসাগরের জীবনের বড় বৈশিষ্ট্য মানবতা। প্রবাহমান সমাজে প্রচুর সমস্যা। সেই সমস্যা গুলো যুক্তি বিচারে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যখন মানুষ সেই

সমাজের সাথে আত্মগত হয়ে যায় । এর পরেই আসে কালের মানুষকে সৃষ্টির ঐশ্বর্য্যে মন্ডিত করা । সংবেদনশীল মানুষ একেই জীবনের ধ্রুব সত্য বলে গণ্য করে । তাই যেখানেই তিনি ছিলেন সর্বত্রই মানবকল্যাণের জন্য সেবা করে গেছেন । জাতিধর্ম বর্ণ স্ত্রী পুরুষ নির্বিচারে তাঁর সেবার কাজ চালিয়ে গেছেন । ১৮৬৮ সালে বর্ধমানে মুসলমান বস্তিতে তাঁর সেবা কার্য্যের কথা স্মরণীয় । তখনকার দিনে জাতি বর্ণ ও বর্ণ বিদ্বিষ্ট সমাজে জাত খোয়াবার তোয়াক্কা না করে মানবতার সেবায় অগ্রসর হওয়া একটা নতুন মানবিক দৃষ্টি কোণের ইঙ্গিত বহন করে ।

স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের কার্য্যক্রম এবং হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্য দেশ ব্যাপী আন্দোলনের সংগঠন এসবের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্যও সেই মানব স্বীকৃতি । ভারতীয় অধ্যাত্ম চিন্তায় যদিও সমস্ত মানুষকেই অমৃতের সন্তান বলে ঘোষণা করা হয়েছে তথাপি প্রত্যক্ষ সমাজ গঠনে কার্য্যত মানুষের মধ্যে অনেক অসঙ্গতি রেখে দিয়েছে । বিদ্যা - সাগরের মধ্যে যে মানবিক বোধের উদ্বোধন দেখা যায় তা পাশ্চাত্যের দেহাত্ম বাদী মানবতার ফলশ্রুতি । বিদ্যাসাগর ছিলেন কর্মবাদী । তাই তিনি তাঁর জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সংগ্রাম করেছেন কর্মের মধ্য দিয়েই । বিধবা বিবাহের আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি শত শত বৎসরের অবক্ষয়িত ভারতীয় সমাজ ব্যাবস্থার অবশিষ্ট মূল্য বোধটুকুকে বাঁচিয়ে রাখার দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা করেছিলেন । এই বিবাহ পদ্ধতি রূপায়ণে বিশ্বের সকল সমাজের গতিপ্রকৃতি তাঁর কাছে এসে ধরা দিয়েছিল । তিনি বিশ্বের সামাজিক বিবর্তন সম্পর্কে সদা জাগ্রত ছিলেন । তাই এই ভারতবর্ষের মাটিতে বিশ্ব জনীন অনুভূতি নিয়ে গড়ে তুলে ছিলেন সাধনার ক্ষেত্র এবং সাধনার উপজীব্য বিষয় বস্তু ছিল মানুষ ।

রমেশচন্দ্র দত্ত ঠিকই মন্তব্য করেছেন " একদিকে স্বার্থপরতা , জড়তা , মূর্খতা , অন্য দিকে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর । একদিকে বিধবাদের উপরে সমাজের অত্যাচার , পুরুষের হৃদয় শূন্যতা , নির্জীব জাতির নিশ্চলতা, অন্যদিকে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর । একদিকে শত শত বৎসরের কুসংস্কার ও কুরীতির ফল , অন্য দিকে ঈশ্বর চন্দ্র

বিদ্যাসাগর। একদিকে নির্জীব, নিশ্চল, তেজোহীন বঙ্গ সমাজ অন্য দিকে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর।"

তাঁর সময়ে যখন ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী বিদ্রোহে কলরব মুখর হয়ে শুধু নিজেদের চিন্তা ও বুদ্ধির মার্গে আবদ্ধ করেছিলেন, ঈশ্বর চন্দ্র সেখানে নিজের কর্মশক্তির প্রেরণায় নতুন সমাজ রচনার চেষ্টা করেছেন। নব্য বঙ্গের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ যখন অবক্ষয়ের পথ প্রশস্ত করছিল তখন তিনি চারিত্রিক দৃঢ়তা শুদ্ধ ও সংযত জীবন নিয়ে সৃষ্টির কাজকে নির্মল ও প্রোজ্জ্বল করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন।

তাঁর উচ্চশিক্ষাক্রমে, প্রাধান্য পেয়েছিল ইংরাজী ভাষা, অঙ্ক, বিজ্ঞান, অর্থ-নীতি ও ইতিহাস। স্ত্রীলোক সহ জনসাধারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষ নিয়ে তিনি লড়াই চালিয়ে ছিলেন সরকারের সঙ্গে এবং শুধু কর্মোন্নতি নয়, প্রাপ্ত পদ মর্যাদা বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করেন নি। মধুসূদনের করুণ পরিণতির মতো কর্তৃপক্ষের চাপে বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ মধ্যবিত্ত সহযোগিতার নীতিতে বড় ফাটল ধরিয়েছিল। তবুও নিজের প্রশস্ত স্কন্ধে তিনি তুলে নিয়েছিলেন অসমাপ্ত জনশিক্ষা, স্ত্রী শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের দুরূহ ভার। স্বাবলম্বনই স্বরাজের প্রথম সোপান সে কথা দেখিয়ে গেছেন এই বীর ব্রাহ্মণ। তাঁর একক ও সর্বস্ব পণ সংগ্রাম জাতীয়তাবাদকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নাই। ২০

ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থাকে যতটা যুগোপযোগী করা সম্ভব, পাশ্চাত্যের ন্যায় শাস্ত্রাদি থেকে পাওয়া সার্বজনীন মানবিক আদর্শে যতটা উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব, আধুনিক দৃষ্টিতে যতটা সমৃদ্ধ করা সম্ভব, বিদ্যাসাগরের ধ্যান ধারণা সেই লক্ষ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তিনিযে নৈতিক মূল্যমানের কাঠামো নির্মাণ করেছিলেন, বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে অও ঐ শাসন কাঠামোর সঙ্গেই একাত্ম। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে সীমাকে চিহ্নিত করতে পারাই আসল কথা নয়, সীমার মধ্যে বিচরণশীল থেকেও

কোন কর্ম ও ব্যক্তিত্ব সীমাকে লঙ্ঘন করে এবং কালান্তরের পথ দেখায় , তাকে জানাই ও ইতিহাসকে তার প্রবহমানতা ও সৃষ্টিশীলতা মধ্যে আবিষ্কার করা সেই বিচারে বিদ্যাসাগর আধুনিক বাংলার অন্যতম স্থপতি , যাঁর আর্বিভাব না ঘটলে সংস্কৃতির রূপান্তর ও নবায়ণ ব্যহত হত । " ২১

অক্ষয় দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ

রামমোহনের ভাবনা ও ইয়ং বেঙ্গল দলের উদ্দীপনা শিক্ষিত সমাজে এক জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান ধর্মী আলোড়নের সৃষ্টি করল । রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্ম সমাজের মঞ্চ শুধুমাত্র ধর্মীয় সংস্কারের পথকে আঁকড়ে থাকল না । সমাজকে প্রগতি ও আধুনিকতার পথে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হলো ।

ব্রাহ্ম আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর । এবং ব্রাহ্ম সমাজের গঠনের কাজে তার প্রধান সহচর ছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত । একই মার্গের যাত্রী হলেও তাদের দৃষ্টি কোন ও প্রবনতা ছিল ভিন্ন । দেবেন্দ্র নাথ ছিলেন অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন আর অক্ষয় কুমার ছিলেন বস্তুবাদী ও তার্কিক ।

এই দুই বিপরীত মুখী প্রবণতা সমস্যার সৃষ্টি করল । ক্রমশ দেবেন্দ্র নাথের ভাবপ্রবণ ভক্তিবাদী ভাবধারা এবং , অক্ষয় কুমারের বস্তুবাদী - যুক্তিবাদী ভাব - ধারার মধ্যে পার্থক্য নিয়ে ব্রাহ্ম সমাজের অভ্যন্তরে এক দারুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো । অক্ষয় কুমার প্লেটো , এরিস্টটল , বেকন , লক , কোঁতে লাপলাস , স্পেন্সার প্রভৃতি চিন্তাধারার মাধ্যমে তিনি অনুপ্রাণিত ছিলেন । বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক মনোভাব প্রচারে অক্ষয় কুমার সমসাময়িকদের মধ্যে অগ্রনী ছিলেন ।

আধুনিক দৃষ্টি থেকে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের পুনর্বিচার হওয়া প্রয়োজন তিনি এই মত পোষণ করতেন। বেদ, উপনিষদ, মনু সংহিতা প্রভৃতি মন্থন করে, এই কথাই তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে বিধবা বিবাহ অসবর্ণ বিবাহ, প্রেম ঘটিত বিবাহ নারী পুরুষের দুইয়ের পক্ষেই বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি প্রত্যেকটিই "বেদোক্ত ও মনু সংহিতা প্রোক্ত ধর্ম্য ব্যবহার।"

ধর্ম সম্পর্কেও অক্ষয় কুমারের মতের পরিবর্তন ঘটেছিল। শেষ জীবনে তিনি ব্রাহ্ম আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন। "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারে তিনি মনে করেছিলেন যে, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কাজ করাটাই ধর্ম, না করাই অধর্ম।" ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণে তার প্রার্থনার এক গণিতানুযায়ী সমীকরণ করে দেখান হয়েছে —
পরিশ্রম = শস্য, প্রার্থনা + পরিশ্রম = শস্য, অতএব প্রার্থনা = 0 । ২২

পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের স্বরূপ তিনি ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। এই শাসনে মনুষ্যত্বের অবমাননা সম্পর্কে তিনি সজাগ ছিলেন। তিনি এই শাসনের কুফল সম্পর্কে মন্তব্য করছেন "তোমার অধিকারে আমাদের স্বাস্থ্যক্ষয়, বলক্ষয় ও ধর্মক্ষয় ঘটিতেছে। তুমি অধিক বিতরণ কি সংহরণ করিতেছ, কে বলিতে পারে? তুমি শিক্ষা দান করিতে গিয়া স্বাস্থ্য হরণ করিতেছ, অর্থোপার্জনের বিবিধ পথ প্রস্তুত করিতে গিয়া শ্রমাতিশয় ও তাহার বিষময় ফলপুঞ্জ উৎপাদন করিতেছ। বাণিজ্য বৃত্তি প্রসারণ করিতে গিয়া অশেষ দোষকর দুর্মূল্যতা দোষ ও তৎসহ কৃত অধর্ম বংশের বৃদ্ধি করিতেছ।" ২৩

অবশ্য ইংরাজী শিক্ষা ভারতের মানুষের মধ্যে যে ঐক্য ভাব জাগিয়ে তুলেছে তিনি সে বিষয়ে সজাগ ছিলেন। তাঁরই বক্তব্য "এই ঐক্য সংস্থায়ী হইলে কোন দুঃখ না মোচন হইতে পারে?" ইংরাজ সম্রাজ্যে ইংলণ্ডের কৃপাদৃষ্টি তিনি

চেয়েছিলেন " ইংলন্ড, তোমার দয়া প্রকাশ ব্যতিরেকে আর আমাদের ভরসা নাই।" ২৪

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক জাগরণ বহু ব্যক্তিকে প্রভাবিত করেছিল। বহু মনীষী নিজস্ব কর্ম ক্ষমতার স্বরূপে এই নব জাগরণে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। সেই সময় বাংলার বুকে সেই রূপ প্রবাহই ছিল স্বতঃস্ফূর্ত।

এ যুগের বৈশিষ্ট্য ও মূল্যায়ন

অষ্টাদশ শতকের মাঝা মাঝি সময় হতেই ইংরেজ শক্তি এদেশে তাদের বানিজিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তার করে ধীরে ধীরে শাসন ব্যবস্থাও নিজেদের হাতে তুলে নেয়। ভারতবর্ষীয় সমাজের সৃষ্টি ধর্মী প্রবণতা প্রায় লুপ্ত হলো। আমাদের সমাজের সে এক অধঃপতনের যুগ। শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম, অন্ধ কুসংস্কার এবং রাজনৈতিক জগতে বিভিন্নতা বিদেশী শক্তির পক্ষে ভারতবর্ষ এত সহজে দখল সম্ভব হয়েছিল।

হিন্দু ধর্মে কুসংস্কার প্রগতির পথ রুদ্ধ করেছিল। সমাজ ছিল অন্ধ শাসনে বদ্ধ। শিক্ষা ছিল সংকীর্ণ পরিধিতে আবদ্ধ। ধর্মে ছিল যুক্তিহীনতার ক্রিয়া কান্ড। তাই ইংরেজ শাসন শুধু মাত্র রাজনৈতিক সত্তায় হস্তক্ষেপ করেনি, সাম্রাজ্যর তাগিদে সর্ব ব্যাপারে ছিল তাদের হস্ত প্রসারণ।

এই পরিবেশে জন্ম নিল সংস্কার বাদীর দল। ইংরেজ তার বণিক বৃত্তির দৃষ্টি কোন নিয়ে বিচার করতে চাইলে সবকিছু। তবুও তার মধ্য হতে দেশীয় মনীষীরা এক নব জাগ্রত ভারতকে বের করে আনতে চাইলেন এই অন্ধকারের আবর্ত হতে। এই সব মনীষীদের মধ্যে যারা সর্বভাবে সক্রিয় ছিলেন তাঁদের কয়েকজনের কথা পূর্বে উল্লিখিত হলো।

রামমোহনের একেশ্বর বাদ প্রচার করার পিছনে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। তিনি মনে করতেন যে এই ভেদাভেদের ফলে দেশ জাতি রাজনৈতিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং দেশ প্রেমের অভাব ঘটেছে। তাই তিনি ব্রাহ্ম আন্দোলনের মাধ্যমে একেশ্বর বাদের প্রচার দিয়ে দেশের বিভিন্ন বর্ণ ও সম্প্রদায় কে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। রামমোহন যদিও ব্রিটিশ রাজত্বে ভারতীয় মনীষা বিকাশের সম্ভাবনাকে সুদৃষ্টিতে দেখতেন তবুও ইংরেজ কর্তৃপক্ষের অন্যায় কাজের সমালোচনায় তাঁর মধ্যে এক বিদ্রোহী সত্তার প্রকাশ দেখা যেত। তাই ১৮২৩ সালের সংবাদ দমনের আইন (Press Ordinance) কিংবা ১৮২৭ সালে বৈষম্য মূলক জুরী আইন (Jury Art) তিনি বিরোধিতা করেছেন। ইংলন্ডে বসেই তিনি কৃষক শ্রেনীর দুরবস্থার দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি সরকারী চাকুরীতে অধিক পরিমাণে ভারতীয় নিয়োগের কথা বলেছেন। বিচার ব্যবস্থাকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা হতে পৃথক করার দাবী তিনিই পেশ করেছেন।

শুধু রামমোহন কেন নব্য বঙ্গীয়রাও রাজনৈতিক কার্যা কলাপ চালিয়ে গেছেন। সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, জুরী প্রথার মাধ্যমে বিচার, স্বদেশ ও বিদেশে ভারতীয় কুলী মজুরদের দুরবস্থা দূর করার জন্য তারা যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন।

নব্য বঙ্গীয়রা সব হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিল। ইংরাজী শিক্ষার সংস্পর্শে এসে তাঁদের মধ্যে মুক্ত চিন্তাধারা বিকাশ লাভ করেছিল। ডিরোজিও জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে স্বাধীনতার উপাসক ছিলেন। তিনি অতি সহজেই ছাত্রদের অন্তরে স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগাতে পারতেন এবং তাদের দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করতেন। এবং এই সময়েই স্বদেশ প্রিয়তা হতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্খা জন্ম লাভ করে।

ডিরোজিও শিষ্যদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রভৃতির দ্বারা

বাংলার ইতিহাসে এই কাল খন্ডের প্রভাব এক নতুন ঐতিহ্যের পথের সন্ধান দিল। সুদীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় বাঙালী যশস্বী, মনীষীরা এই নব জাগরণের ধারাকে সঞ্জীবিত করলেন ।

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ সাম্রাজ্য বাদের প্রসার ঘটল। সাথে সাথে বিস্তৃত হলো পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি, দর্শন ও অর্থনীতির স্বরূপ। বাঙালী মানসিকতা প্রাথমিক ভাবে সেই নতুন পরিবেশ গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করল। কিন্তু পরবর্তীতে বাঙালী তাকেই আত্মস্থ করে নতুন জীবনের মূলবোধকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলো। তাই এ যুগ চেতনায় ধ্বনিত হলো একটি অমোঘ মন্ত্র ' মুক্তি ' । মুক্তি অন্ধ বিশ্বাস হতে, মুক্তি অশিক্ষার বাতাবরণ হতে, মুক্তি ধর্মীয় অনুশাসনের বেড়া-জাল হতে, মুক্তি সমাজের অবক্ষয়িত পুরনো ভ্রান্ত ধারণা হতে। এই মুক্ত চিন্তা মানুষের মনে সৃষ্টি করল শাস্ত্র, পুঁথি, পাঁজিকে নির্মোহ দৃষ্টি দিয়ে সেই সব বিশ্বাসের পূর্ণ মূল্যায়ন করার। এঁরাই জীবনের গতিশীলতাকে স্বীকৃতি দিলেন। বিশ্বকে আপন করে নেওয়ার তাগিদ হতে জন্ম নিল শিক্ষা গ্রহণের তীব্র বাসনা। বিদ্যাসাগরও অধ্যয়নের মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তি ও চিত্তবৃত্তির উন্মেষে বিজ্ঞান চেতনার অভিষেক ঘটালেন।

ব্যক্তিকে জীবনবোধের মূল্য দিয়ে বিচার করে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বোধের জাগরণের উন্মেষ ঘটাল। ব্যক্তি চিন্তাকে আশ্রয় করে সামাজিক চিন্তার ক্ষেত্র প্রসারিত হলো। জাতীয় জীবনে গতি সঞ্চার করে দেশাত্ম বোধের সৃষ্টি করল। শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে সমাজে অবহেলিত নারী জাতির মুক্তি আকাঙ্খা প্রবলতর হলো। নারীর প্রতি নবরূপে জন্ম নিল শ্রদ্ধা বোধ। সামাজিক উন্নতি সাধনে নারীর সাহচর্য্য অনুভূত হলো। অন্ধ বিশ্বাস বা কুসংস্কারের পরিবর্তে স্থান করে নিল যুক্তি ও বিচার বোধের নির্মল স্রোত। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সংগ্রামশীল মনোবৃত্তির সূচনা ঘটল। সভা সমিতি গঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক কার্যকলাপ গৃহীত হলো। এই বাসনাই পরবর্তীতে জন্ম দিল স্বাদেশিকতা বোধ ও স্বাজাত্য শাসনের অঙ্কুর। শিক্ষা প্রসারণের মানসিকতা

মুদ্রা যন্ত্র আবিষ্কার ও সংবাদ পত্রের জন্ম দিল । সংবাদ পত্র একদিকে যেমন সাহিত্য সৃষ্টির মানসিকতা তৈরী করল অন্য দিকে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মানসিক ভাবনাকে জাগ্রত করল ।

এই শতকের ভাবনা বিশ্লেষণ মুখী ছিল । " বাঙালী নব জীবন বোধকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল । তারই ফলে , যে মানুষকে সব সময় ধর্ম দিয়ে , সমাজ দিয়ে , অনুশাসন দিয়ে বন্দী করে রাখা হতো সে মানুষকে বন্দীমুক্ত করার প্রয়াস শুরু হলো । নতুন চেতনার উন্মেষে বাঙালীর মধ্যে সংস্কার বাসনা জেগে উঠল । বাঙালী মন ও মনন প্রাচীন চিন্তাকে তাই আর হুবহু গ্রহণ করতে সম্মত হল না । দীর্ঘদিন যে সমস্ত প্রথা বা নিয়মে জীবন নিয়ন্ত্রিত এবং জীবনের চলা নির্ধারিত হতো বর্তমানের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে সেগুলির পরিবর্তন বা সংস্কারের প্রয়াস জাগল । বাস্তব জীবনে সত্য প্রতিষ্ঠার উপযোগিতা বাঙালী জীবনে গভীর ভাবেই অনুভূত হলো । ২৬

বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতি হতে মধ্য যুগের বিদায় ঘটল । ভৌগোলিক সংকীর্ণতার অবসান ঘটল । ইউরোপের ঝড়ের হাওয়া আমাদের রুদ্ধ দ্বারে প্রবল আঘাত হানল । দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের বহু উত্থান পতনের পর উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে বাঙালীর সাহিত্য ও জীবনের নববিকাশ ঘটল । " সে রেনেসাঁসের অর্থ – মানব মহিমা - বুদ্ধিদীপ্ত বাস্তব চেতনার প্রাধান্য । মধ্য যুগীয় ধর্মৈষণা , আবেগ ব্যাকুলতা , মাথুর ভাব সম্মেলন , চন্ডী মনসা ধর্ম ঠাকুরের নিরাপদ নির্ভর ছায়াতল ছাড়িয়া মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক বাঙালী আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসা – কল্লোলিত লবনাক্ত সিন্ধুতীরে নিক্ষিপ্ত হইল , জগৎ ও জীবনকে আত্ম প্রত্যয় সিদ্ধ বুদ্ধির ভূকেন্দ্র হইতে চিনিয়া লইবার চেষ্টা করিল । ইহাই বাঙালীর নব্য রেনেসাঁস । ২৭

"Such a Renaissance has not been anywhere else in the World history.....On our hopelessly decadent society, the rational progressive spirit of Europe struck with resistless force"."

সিপাহী বিদ্রোহ ও সমাজ মানস

১৮৫৭ সাল। ভারতে এক বিদ্রোহের ঝড় বয়ে গেল। ইংরেজরা বলল "সিপাহী বিদ্রোহ"। কিছু কালের জন্য উত্তর ভারতের সামগ্রিক চিত্র বদলে গেল। দেখা গেল এক কালান্তর। ব্যারাকপুর থেকে মীরাট, কানপুর থেকে লক্ষ্ণৌ, বেরিলী থেকে দিল্লীর মনোভাব বিদ্রোহের তিক্ত অভিজ্ঞতায় ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে অবিশ্বাসের এক রক্ত রঞ্জিত প্রাচীরের বিভেদ সৃষ্টি করল।

১৭৫৭ হতে ১৮৫৭ পর্যন্ত সুদীর্ঘ একশত বছরের ইতিহাস ব্রিটিশ শোষনের ইতিহাস। 'হিন্দু পেট্রিয়টে' হরিশচন্দ্র লিখছেন 'The disease secured to have disappeared, when its symptoms broke out afresh and in their indications showed that it was neither fat of oxen not the dread proselytism but a deep rooted case of estrangement that led to these mutinous that break.' ২৮

সিপাহী বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সরাসরি আঘাত। তাদের শাসনকে অস্বীকার করা এবং এর মধ্যেই ছিল বিদ্রোহের বীজ নিহিত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে সরাসরি বিদ্রোহ এবং স্বাধীনতার দাবি প্রথম রেখেছিল হিন্দু পেট্রিয়ট এবং সেটা ১৮৫৮ সালেই। বিশিষ্ট ইংরেজ প্রাবন্ধিক পি. লোভেট তাঁর 'জার্নালিজম ইন ইন্ডিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন — ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের সময় থেকেই নাকি ভারতবর্ষে প্রকৃত সাংবাদিকতার সূচনা হয়। বুঝতে অসুবিধে হয় না, প্রকৃত গণ সংগ্রামকে চিরদিনই এরা কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে ছোট করে দেখার চেষ্টা করেছেন।'

১৮৫৭ সালের ঐতিহাসিক অভ্যুত্থান তখনকার নিস্তব্ধ ভারতে এক নব জীবনের আলোড়ন এনে দিয়েছিল। অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলেও এর [illegible] গেল এক আদর্শ বোধ যা হতে জন্ম নিল বহু বিদ্রোহের মহীরুহ।

সিপাহী বিদ্রোহের আগুন নিভতে না নিভতে বাংলা দেশের সর্বত্র তথা বিহারের কিছু কিছু অংশ নীল বিদ্রোহের উত্তপ্ত আগুনে ঝলসে উঠল। নীলচাষ ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে তুলল ও কৃষকের জীবনে নিয়ে এল এক দুর্বিষহ ও সর্বনাশা অভিশাপ। পাদরী লং নীল বিদ্রোহের কারণ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন (১) জিনিস পত্রের মূল্য বৃদ্ধি, (২) শ্রমের মূল্য বৃদ্ধি, (৩) আধুনিক রাজনৈতিক ঘটনাবলী সঞ্জাত রাজনৈতিক উত্তেজনা, (৪) কৃষকদের প্রতি শিক্ষিত মধ্য বিত্তদের সহানুভূতি। রাজনৈতিক ঘটনা বলতে ১৮৫৭ এর জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। এই নীল বিদ্রোহে

" The tyranny of the planters provoked a real mass upsurge amongst the cultivators which even the Royal Institute of International Affairs has noted" a landmark in the history of nationalism".

নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও সংঘবদ্ধ। ১৮৫৯ সালে কৃষ্ণনগরের গ্রামাঞ্চলে নীল বিদ্রোহের প্রথম সূচনা হয়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহের আগুন নদীয়া, যশোহর, রাজশাহী, পাবনা, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে জ্বলে ওঠে। প্রায় ৫০ লক্ষ কৃষক এই বিদ্রোহে যোগ দেয়। উত্তরবঙ্গে এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন ওয়াহাবী নেতা রফিক মন্ডল। অন্যান্য নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন নদীয়ার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস এবং জয়রামপুরের রামরতন মল্লিক যাঁকে বাংলার নানা সাহেব বলা হতো।

নীল বিদ্রোহে শিক্ষিত বাঙালী সমাজ সমর্থন জানাতে দ্বিধা করেন নি। ১৮৬০

খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্র ' নীলদর্পন ' রচনা করেন । এই নাটকে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের এক ভয়ঙ্কর চিত্র তিনি তুলে ধরেছিলেন । এই নীলদর্পনের ইংরাজী অনুবাদ করেন মধুসূদন দত্ত । জেমস রেভারেন্ড লং এর প্রকাশনা করেন । উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে এই অত্যাচারের কাহিনী ইংরেজদের নিকট পৌঁছে দেওয়া । এই অপরাধে লং এর এক মাসের কারাগার ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয় । কালি - প্রসন্ন সিংহ তৎক্ষনাৎ সেই টকা জমা দেন । এই সংবাদ প্রকাশিত হলে বাংলায় এক অভূত পূর্ব উত্তেজনার সৃষ্টি হয় । সেই সময় বড় লাট ছিলেন লর্ড ক্যানিং , তিনিও স্বীকার করেছেন "The indigo rebellion caused him more anxiety than he had felt since the days of Delhi".
জনসমক্ষে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী নিয়মিত ভাবে তুলে ধরেছিলেন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।

১৮৫৭ এর পর ভারতে জাতীয়তাবাদী ধারার গতি প্রবলতর হতে লাগল । ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে ঘটল ব্যাপক পরিবর্তন । কর্মহীন এই মধ্যবিত্ত শ্রেনীর মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসন্তোষ সৃষ্টি করল । বৃটিশ শাসনের প্রকোপ যত ঘনীভূত হতে থাকল ততই তীব্র হলো মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে জাতীয় আন্দোলনে সংযুক্ত হওয়ার অনুভূতি । এই মধ্যবিত্ত শ্রেনী আন্দোলনের জন্য একটি মাধ্যমের অনুসন্ধান করতে লাগল ।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় ইংরেজ দের নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে এক গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল । বিদ্রোহ চলা কালীন সময়ে মাত্র তিন দিনে ৩ হাজার ভারতবাসীকে ফাঁসির কাঠে ঝোলানো হয়েছিল । ইংরেজ শাসনের নগ্ন চরিত্র ভারতবাসীর কাছে উন্মোচিত হলো । ব্রিটিশ শাসনের যে ' সভ্য স্বরূপ ' তা এত বর্বর ও নিষ্ঠুর ভারতবাসী মাত্রেই তা বুঝতে পারলো । এর ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেনীর মধ্যে জাতীয়তা বাদের স্ফুরন দেখা দিল । ইংরেজ শাসনের প্রতি যে মোহাবেশ ছিল তা কেটে গেল । প্রতিবাদ ও সমালোচনার ঢেউ গর্জে উঠতে

শুরু করল বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে। সাম্রাজ্যবাদীদের ঘৃন্য স্বরূপ প্রকটিত হতে লাগল। তাই নিজ দেশের অবহেলিত কৃষক সমাজের প্রতি ও মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে এক আত্মীয়তা ও আত্ম সচেতনতার সৃষ্টি করল। তাদের মনের মধ্যে এক বিপুল জিজ্ঞাসা নিয়ে এই নির্যাতিত নিপীড়িত কৃষক শ্রেনীর পাশে দাঁড়বার আকাঙ্খা তীব্র হলো। পরাধীনতার গ্লানি হতে জন্ম নিল স্বাধীনতার আকাঙ্খা। এই মনোভাবের প্রকাশ ঘটল জাতীয় চেতনার সকল ক্ষেত্রে — সাহিত্যে, বিজ্ঞানে শিল্পে। এই পরিবেশ নব জাতীয়তাবাদের জন্ম দিল। এবং এই জাতীয়তা বাদের ধারাকে পুষ্ট করল আর অনুষঙ্গ বিষয় সমূহ।

সাহিত্য ও স্বাদেশিকতা বোধ

সিপাহী বিদ্রোহ সমাপ্ত হলো। কিন্তু এর ফল ছিল সুদূর প্রসারী। সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে বাংলার বুকে স্বদেশ চেতনার প্রবাহ বয়ে গেল। যে স্বাদেশিকতার স্রোতস্বিনী ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছিল ফল্গুধারার মতো, এবার এই প্রবাহে এল তীব্র জলধারা, স্বদেশ প্রাণতার মন্ত্রে অভিষিক্ত সেই প্রবাহ। বাংলায় আবির্ভাব হলো ব্যাপক ভাবে সাহিত্য কীর্তির প্রোথিত যশা সম্ভ্রান্ত লেখক সমূহের। স্বাদেশিকতায় আদর্শ বোধ, সাহিত্যের মূল্য বোধ, জীবন- সাধনার বিষয় বস্তুকে এঁরা সাহিত্যের প্রাঙ্গনে উপহার দিলেন। মানবিক গুন ও সাহিত্যের গুনে সমৃদ্ধ এই বাংলার জগতে দিকপাল রূপে আবির্ভূত হলেন কবি মধুসূদন, নাটকার দীনবন্ধু মিত্র, ঔপন্যাসিক বঙ্কিম চন্দ্র। The post Mutiny era in the history of Bengal was marked in the next place by a magnificent outburst of creative activity in literature." ২৯

এই যুগে বাংলা কাব্যেও আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটল। প্রাচীন আদর্শের শেষ

কবি ও নতুন আদর্শের প্রথম কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত। তিনি ছিলেন যুগ সন্ধির কবি। তাঁর কাব্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল দেশাত্মবোধ। তিনি কাব্যকে লৌকিক জীবনের ক্ষেত্র হতে মুক্তি দিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত প্রবর্তিত আধুনিক মননের বিকাশ ক্ষেত্র প্রকাশিত হলো, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে।

বঙ্কিম চন্দ্র ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, " মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রাম গোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গলা দেশে দেশ - বাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যেতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশ বাৎসল্য তাহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্বগামী। ঈশ্বর গুপ্তের দেশ বাৎসল্য তাঁহাদের মতো ফলপ্রদ না হইয়াও তাঁহাদের অপেক্ষা তীব্র ও বিশুদ্ধ।"

ভাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসীগণে
প্রেম পূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

বঙ্কিম চন্দ্রের এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য নয়। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় দেশ প্রেমের আকুতি ছিল, ছিল স্বাদেশিকতা বোধ, কিন্তু ইংরেজ আনুগত্য তার কবিতায় বহু ছত্রে ধ্বনিত হয়েছে। ইংরেজ এরবিরুদ্ধে যারা যুদ্ধে নামে তারা শত্রু। নানা সাহেব, ঝাঁসির রাণীর প্রতি তিনি নির্লজ্জ ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তাই তিনি ছিলেন যুগ সন্ধির কবি কারণ দ্বৈত সত্তাই তাঁকে সেই মর্যাদা দান করেছে।

বাঙ্গলা সাহিত্যে দেশ প্রেমের বা জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত দেখা দিয়েছিল মধ্যযুগের সাহিত্য মন্ডলের বিকাশ ক্ষেত্রে। বাঙ্গলার নিজস্ব আকুতি, সামাজিক মূল্যবোধ, স্থানিক প্রীতি মধ্যযুগের কাব্য কথায় ছিল এক প্রাণ বন্ত আবেগ।

নরহরি কবিরাজ মন্তব্য করেছেন " বাংলায় ন্যাশানালিটি গঠণের প্রক্রিয়াটি পরিপুষ্ট হতে থাকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে জাগরণ দেখা দেয় তার মধ্য থেকে । এই সময়ে উপোরক্ত ধর্ম প্রচারকদের লেখা ও ভাষণকে কেন্দ্র করে ধর্মাশ্রয়ী এক ধরণের সাহিত্য গড়ে উঠেছিল । কবীর নানক ও চৈতন্য ভক্তদের পদাবলীতে জনতার কাছে সহজ বোধ্য ভাষায় প্রচারের মাধ্যমে এক সর্বজন বোধ্য অসাম্প্রদায়িক জনপ্রিয় সাহিত্য গড়ে উঠতে থাকে ।

বিদগ্ধ সাহিত্য রসিকরা কখনও রাজসভা থেকে কখনও জনসভা থেকে যে সাহিত্য রচনা করতেন তাও ছিল বাঙালী মাত্রেরই সম্পদ । কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম, দৌলত কাজী, আলাওল, ভারত চন্দ্র, রাম প্রসাদ নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য গুণে পৃথক হলেও তাঁরা প্রত্যেকে ছিলেন বাঙালী কবি ।

রাজার মেয়ে বিদ্যা, ব্যাধের মেয়ে ফুল্লরা, অভাব গ্রস্ত গ্রাম্য কবি — সমাজের স্তর ভেদে জীবন প্রবাহে তাদের বহু পার্থক্য সত্তেও তারা এক জায়গায় এক — তারা সবাই বাঙালী ।

" ভারত চন্দ্রের কাব্য রসেও এই বাঙালী মন রয়েছে সঞ্চারিত । গঙ্গা বিধৌত বাংলার সেই প্রেম গাথা অনুরণিত বিদ্যার কণ্ঠে ' হায় বিধি সে কি দেশ গঙ্গা নাই যেথা ' । মোট কথা সাহিত্যে, সঙ্গীতে পালা অভিনয়ে বাঙালী এক ভাষায় কথা বলতে শুরু করে, এক ধরণের আবেগ প্রকাশ করতে থাকে, এক ধরণের রুচির পরিচয় দিতে থাকে ।" ৩০

এই সাহিত্য ভাবনা পরবর্তীতে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে । বাংলা নিজস্ব সংস্কৃতি ভারতীয় ভাবধারার সাথে ঘটেছে ভাব সম্মিলন । উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাংলার সাহিত্য সম্পদে বিকশিত হয়েছে ভারত ভাবনা তথা জাতীয়তাবাদের প্রচন্ড স্রোত ।

অবশ্য এই সময়টা ছিল শিক্ষিত বাঙালীর মানসিক বিকাশের যুগ। এই যুগ চেতনায় জন্মে ছিল স্বাজাত্য গর্ব ও জাতীয়তাবোধ। শিক্ষিত বাঙালীর আত্ম সম্মান বোধ জন্ম দিয়েছিল সমাজ সংস্কারের। আর্থিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি পূর্বের চেয়ে দৃঢ়তর হওয়ার জন্য স্বাভাবিক ভাবে স্বাজাত্য বোধের চেতনা ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছিল তেমনি ভাবে শিক্ষিত বাঙালী সমাজ বিদেশী শক্তি ইংরেজের নিকট চাকুরীজীবী রূপে উপযুক্ত সম্মান পায়নি। এবং এই বঞ্চনা বোধ হতে জন্ম নিল দেশকে ভালবাসার স্বপ্ন। সুকুমার সেন' এর ভাষায় " চাকুরী পরায়ণ শিক্ষিত বাঙালী উপযুক্ত সম্মান পায় নাই, সেই ক্ষোভেই ' ন্যাশনাল ' আন্দোলনে ঢেউ তুলিয়াছিল। " ৩১

এই জাতীয়তাবোধের ভাবনা আরও তীব্রতর হলো যখন বিদেশী শাসনের অন্যায় অবিচার কর্মের তীব্র দাবানল দেশবাসীর বুকের মধ্যে দহনের সৃষ্টি করেছিল। বিদেশী শাসক বর্গের সেই অত্যাচার যা জনসাধারণ নীরবে সহ্য করছিল তা আর চাপা রইল না। তার বাহঃ প্রকাশ ঘটল সাহিত্যের দর্পনে। শাসক বর্গের বিরুদ্ধে নালিশ রূপে যেমন আবির্ভাব হলো, সাহিত্যের প্রাঙ্গণে তেমনি কোথায় বিদ্রোহ বাণীর ঝলক দেখা দিল বিদ্যুৎ প্রভার মতো।

সুকুমার সেন বলছেন " সাহিত্যে জাতীয়তাবোধের প্রথম প্রকাশ দেশের অতীত ইতিহাসের দোলায় দেশ প্রেমের লালন, দ্বিতীয় প্রকাশ জনসাধারণের স্বাধীনতা হীনতার প্রতি সচেতনতা, তৃতীয় প্রকাশ ভারতবর্ষের অখণ্ডত্ব অনুভূতি, চতুর্থ প্রকাশ শাসন কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অনুপায় শাসিতের বল প্রয়োগ চালনা। " ৩২

মধুসূদন

পাশ্চাত্য ভাবধারার অভিঘাতে পাশ্চাত্যের অনুকরণ প্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে এক সর্বজনীন মুক্তি চেতনায় যখন বাঙালী মানস উদ্বেল মধুসূদনের আবির্ভাব তখনই। দুর্জয়

পৌরুষত্ব ও দুর্ধর্ষ শক্তি মত্ততা নিয়ে দু:সাধ্য সাধনের ব্রতী অবিচল ছিলেন তিনি। যদিও তখন গদ্য ভাষার সৃষ্টি হয়েছে সেই গদ্য তখন প্রয়োজনের মাধ্যমে বিতর্ক ও বিচারের হাতিয়ার যা রস সৃষ্টির শৈলী উপকরণ হয়ে উঠেনি। ধর্মীয় বিষয় থেকে মুক্ত করে কবিতা রচনা করলেন ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়। তাঁদের কবিতায় সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহের ধারা এল, ঐতিহাসিক বিষয় বস্তু প্রধান্য পেল। তাঁরা দীর্ঘ আখ্যায়িকার চমৎকারিত্ব, ও উদ্দীপনা মূলক বীর রস সৃষ্টি করে কাব্যের মধ্যে নব যুগের ক্রিয়াময় উত্তেজনা এবং আবেগ রঞ্জিত দেশাত্ম বোধ সঞ্চার করলেন।

কিন্তু মধুসূদন কাব্যে রূপ রীতি ও প্রকাশ ভঙ্গীতে আনলেন মুক্তি। তীব্র স্রোতস্বিনীর মতো তিনি পুরনো গতি পথের উপর ভাঙ্গন সৃষ্টি করে দুই তীরকেই প্লাবিত করলেন বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে। মেঘনাদ বধ কাব্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি বিশিষ্ট রূপ প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সেই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনুভব করে বলছেন – " মেঘনাদ বধ কাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধ ও রচনা প্রনালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙ্গিয়াছেন এবং রাম - রাবণের সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আমাদের মনে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধা পূর্বক তাহারও শাসন ভাঙ্গিয়াছেন। এই কাব্যে রাম লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ ইন্দ্রবিৎ বড় হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্ম ভীরুতা সর্বদাই কোনটা ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্ম ভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ, দৈন্য, আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবি হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতস্ফূর্ত শক্তির প্রচন্ডলীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন"।

এই মানুষযে দেশের পরাধীনতায় ব্যথিত হবেন এ তো স্বাভাবিক। পরাধীনতার প্রতি তাঁর আক্ষেপ ছিল আবেগ সম্ভূত —

" আমরা দুর্বল, হীন, কুখ্যাত জগতে
পরাধীন, হা বিধাতঃ আবদ্ধ শৃঙ্খলে ?"

যদিও এই কবিই তাঁর Extemporary Song's লিখেছিলেন —

And, Oh, I sigh for Albion's sand
As if she were my native land'.

অথচ এই কবিই দেশের পরাধীনতায় আক্ষেপ করেছেন —

কে না লোভে, ফনিনীর কুন্তলে যে মণি
ভূপতিত তারা রূপে, নিশাকালে জ্বলে
কিন্তু কৃতান্তের দূত বিষ দন্তে গণি,
কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে বলে ?
হায় লো ভারত ভূমি !

কবি মাতৃভূমির অতীত গৌরবকে স্মরণ করেছেন বারবার,

শুন গো ভারত ভূমি, কত নিদ্রা যাবে তুমি
আর নিদ্রা উচিৎ না হয়
উঠ ত্যজ ঘুম ঘোর হইল, হইল ভোর
দিন কর প্রাচীতে উদয় !

দেশের প্রতি মাইকেলের আত্মীয়তা বোধ ছিল গভীর। জীবনের বহু ট্রাজেডীর মাঝেও মধুসূদনের মানসিকতার ঐশ্বর্য্য বিন্দু দেশের মাটিতেই প্রোথিত ছিল। তাই গর্ব করেই তিনি বলেছিলেন, " আমি শুদ্ধ বাঙালী নহি, আমি বাঙ্গাল, আমার বাটি যশোহর। " ৩৩

দীনবন্ধু মিত্র

এই সময় আরেক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সাহিত্যের আকাশে প্রতিভাত হয়েছিল তিনি

দীনবন্ধু মিত্র। চাকুরী সূত্রে গ্রাম গঞ্জে ভ্রমণের তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন নীল চাষীদের ওপর ইংরেজদের অত্যাচারের স্বরূপ। নীল বিদ্রোহ যখন বিস্ফোরিত তখনই তিনি লিখলেন 'নীল দর্পন'। 'নীল দর্পন' শুধু সাহিত্যের গুণে সার্থক নাটক নয়, এ যেন সমাজ জীবনের বাস্তব চরিত্র। বঙ্কিম চন্দ্র এই নাটক সম্পর্কে মন্তব্য করছেন, " এই যে প্রজা পীড়ন যেমন তিনি জানিয়ে ছিলেন এমন আর কেহ জানিতেন না। তাঁহার স্বাভাবিক সহানুভূতির বলে সেই পীড়িত প্রজা দিগের দুঃখ তাহার হৃদয়ে আপনার ভোগ্য দুঃখের ন্যায় প্রতীয়মান হইল, কাজেই হৃদয়ের উৎস কবিকে লেখনী মুখে নিঃসৃত করিতে হইল।" এই বঙ্কিম চন্দ্রই 'নীল দর্পন'কে বাঙালীর Uncle Tom's Cabin বলেছেন। রেভারেন্ড লং সাহেব মাইকেল মধুসূদনের দ্বারা এই নীল দর্পনের ইংরাজী অনুবাদ করিয়েছিলেন। এই অপরাধে লঙের কারাবাস ও জরিমানা হয়। অনুবাদটা ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়েছিল। ফলও হয়েছিল তীব্র। বাংলা দেশে ইংরাজ বিরোধী আন্দোলন নীল আন্দোলন দিয়েই শুরু হয়েছিল এবং এই আন্দোলনকে উত্তপ্ত করার জন্য 'নীল দর্পন' এর প্রভাব ছিল সক্রিয়। তাই বাংলার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ইতিহাসে এই নাটকের গুরুত্ব অপরিসীম।

বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিম চন্দ্রের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্য তথা দেশাত্মবোধ জাগরণের ইতিহাসে এক দুর্লভ স্মরণীয় ঘটনা। একদিকে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য রূপী বৃক্ষ পুষ্প মেলবে ফুলে ও ফলে যেমন সমৃদ্ধ হলো অন্যদিকে বাংলাদেশ পেল জাতীয়তাবাদের উদ্বেল মন্ত্র। এই মন্ত্রের ঝংকারে ভারতবর্ষও ঝংকৃত হলো দেশাত্মবোধের চেতনায়।

Bankim Chandra's imagination was stirred by thoughts of Nationalism all through his literary career, his mind was espically occupied with the problem of National independence,national unity and happiness of the nation as a whole". ৩৪

বঙ্কিম চন্দ্র সাহিত্যের ক্ষেত্র হতে নিজের ও ভাবনাদর্শের কথা ব্যক্ত করেছেন। বঙ্কিমের সময় ভারতবর্ষের মানসিকতারও রূপান্তর ঘটতে শুরু করেছিল। ইউরোপ সম্পর্কে মানুষের মোহের ভাব কাটতে শুরু করেছে। একদিন যে ইউরোপ ' সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার পৃষ্ঠভূমি বলে ঘোষিত হত বঙ্কিম সেই ইউরোপের প্রকৃতিগত পরিবর্তন অনুভব করেছিলেন। ইউরোপের আজ উগ্র যুদ্ধপ্রিয়তা, আক্রমনশীল জাতীয়তাবাদ ও উপনিবেশবাদের আড়ালে সাম্রাজ্যবাদ বঙ্কিমের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। তিনি লিখছেন " ইউরোপীয় Patriotism ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পর সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে।"

বঙ্কিম ইউরোপের প্রগতিশীল চিন্তাধারা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। বরং ইতালি ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের যুদ্ধ বিরোধী, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। ' বঙ্গ দর্শনে ' ভারত একতা ' নামে এক প্রবন্ধে তিনি ইতালি ও অন্যান্য দেশের জাতীয় আন্দোলনের আদর্শটি অনুসরণর জন্য ভারতবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। তিনি ইউরোপের চিন্তাধারার সাথে বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন। মিলের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে তিনি বলেছিলেন " আত্ম সুখের বৃদ্ধি বা জনপ্রিয়তা লিপ্সা নয়, মানুষের প্রতি নিস্বার্থ ভালবাসাই প্রকৃত হিত কর্মের ভিত্তি হতে পারে। তিনি মনে করতেন তৃপ্তি পাবার জন্য আমরা ভালবাসিনা, ভালবাসি বলেই তৃপ্তি পাই। সকল প্রাণীর মধ্যে পরমাত্মা বিরাজমান, তথা আত্ম পর কোন ভেদ নেই

বলে অন্যের সুখ বিধানেই আমার সুখ । " ভারতীয়রা পার্থিব সম্পদের জন্য পাশ্চাত্যের মোহরাশিতে যে ভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ছে তাতে তিনি বেদনা অনুভব করতেন । তিনি পরিহাসের সুরে বলছে " হর হর বম বম । বাহ্য সম্পদের পূজা কর । এ পূজার তাম্র শ্মশ্রুধারী ইংরেজ নামে পুরোহিত,এডাম স্মিথ পুরাণ এবং মিলতন্ত্র হইতে এ পূজার মন্ত্র পড়িতে হয় .... শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে নৈবেদ্য এবং হৃদয় হইতে ছাগবলি । এ পূজার ফল ইহলোকে এবং পরলোকে অনন্ত নরক । " অগুস্ত কোঁৎ এর ভাবনা " ভালবাসাই আমাদের জীবনাদর্শ, শৃঙ্খলা জীবনের ভিত্তিভূমি, আর প্রগতি একমাত্র অনিষ্ট । " বঙ্কিম চন্দ্র এ ভাবনায় বিশ্বাসী ছিলেন । কিন্তু বঙ্কিম বিশ্বাস করতেন এই সকলের নিয়ন্তক ঈশ্বর যিনি মানুষের সাথে মানুষের সংহতি স্থাপন করছেন ।

বঙ্কিম চন্দ্র মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন দেশের মাটিতে । তিনি ভারতের অসহায় পরিবেশে হিন্দু আদর্শের পুনরুজ্জীবনের কথা বললেন । এই আন্দোলন কোন সংকীর্ণ মনোভাবের আন্দোলন ছিল না । হিন্দুর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বঙ্কিম বললেন -- " যে লোক কেবল জাতি মারিতেই ব্যস্ত, তাহার গলায় গোছা করা পৈতা, কপালে কপাল জোড়া ফোঁটা, মাথায় টিকি এবং গায়ে নামাবলী, মুখে হরিনাম থাকিলেও তাহাকে হিন্দু বলিব না । " তেমনি বৈষ্ণব সম্পর্কে বলছেন, ' যখন সর্বত্র সমান জ্ঞান, সকলকে আত্মবৎ জ্ঞানই বৈষ্ণব ধর্ম, তখন এ হিন্দু ও মুসলমান , এ ছোট জাত ও বড় জাতি এইরূপ ভেদ জ্ঞান করিতে নাই । যে এরূপ ভেদজ্ঞান করে সে বৈষ্ণব নহে । "

দেশীয় ভাবনার মধ্যে জাতীয়তাবাদের বীজের অন্বেষণ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চেতনার সঙ্গে মিশ্রিত জাতীয়তাবাদের জাগরণ ছিল বঙ্কিম চিন্তার বৈশিষ্ট্য । ধর্মে দেশ ভক্তির স্থান নির্নয় করে দেশ ভক্তি ধারণা সম্পর্কে বঙ্কিম এক অসাধারণ অবদান রেখেছেন । বিপিন পালের ভাষায় ' বঙ্কিম ছিলেন নতুন দেশ ভক্তির

জনক ।' ' আনন্দমঠ' ও ' বন্দেমাতরম ' মন্ত্র এই স্বদেশ প্রেমেরই প্রকাশ । সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ঘটনাকে বঙ্কিমই সর্বপ্রথম ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মর্যাদা দিতে সক্ষম হলেন । দেশ জননীকে দেবী দুর্গার সাথে বরণীয় করে তাঁকে উপাস্য করে গড়ে তোলার ভাবনায় বঙ্কিম অনন্য । " কমলা কান্তের মুখ দিয়ে তিনি অক্ষম উপরোধের হীন সারমেয় নীতি ছেড়ে দিয়ে চরমপন্থীদের বৃষ তুল্য বিক্রম প্রকাশের উপদেশ দিয়েছিলেন । তিনি তাদের সামনে দেশ মাতৃকার যে চিত্র তুলে ধরেছিলেন তাতে মায়ের দ্বি- সপ্ত কোটি ভুজে ধৃত ছিল – ভিক্ষা ভান্ড নয়, খর করবাল । ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে যে নতুন প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটেছিল তার কাছে কংগ্রেসের ' বাবু ' সদস্যদের দীর্ঘ ভাষণ, বাংলার আইন পরিষদে বিতর্ক বা প্রশ্ন উত্থাপন করে সরকারী কাজকর্মে বাধাদানের ছেলেখেলা বা কলকাতা কর্পোরেশনের বিচিত্র কৌতুক সৃষ্টি করে পৌর শাসনের কর্মসূচী পন্ড করে দেওয়ার প্রতিভা অবজ্ঞার বিষয় হয়ে উঠেছিল । এদের হৃদয়ে বঙ্গ জননীর প্রতি নিখাদ ভালবাসা, তাঁর অসামান্য মহিমার বিশুদ্ধ ভক্তি বঙ্কিমচন্দ্রই সঞ্চারিত করে দিয়েছিলন, তিনিই তাদের দীক্ষিত করেছিলেন ' বন্দেমাতরম ' মন্ত্রে । ৩৫

বঙ্কিম চন্দ্র অনুভব করেছিলেন ভারতের দুর্দশার মূলকারণ মুক্তির জন্য এদেশের মানুষের নিস্পৃহতা ও হিন্দু সমাজের অনৈক্য । তাই ' আনন্দমঠ ' এ সত্যানন্দ সন্তানদের উদ্দেশ্যে যে উদ্দাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন তাতে সকলেই আসুরিক ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের মনোস্মাদনা জাগাবার ডাকই শুনেছিলেন । বঙ্কিম চন্দ্রের আনন্দমঠ ছিল জাতীয়তাবাদ জাগরণের গীতা । কিন্তু নিখিল সুর বলছেন – " আনন্দমঠ জাতীয়তার গীতা নয়, বর্ণ পরিচয় । বর্ণ পরিচয়ের জ্ঞান যেমন সমস্ত গ্রন্থ পাঠে সাহায্য করে তেমনি ' আনন্দমঠ' দেশকে দিয়েছিল জাতি প্রতিষ্ঠার ভাবনা ও প্রেরণা । " ৩৬

বঙ্কিম চন্দ্র চেয়েছিলেন সকল বন্ধন থেকে জাতির মুক্তি । শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের

মধ্য দিয়ে ঐক্য বদ্ধ ভারতবর্ষের এক সুমহান স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। সেই কারণে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর ধর্মানুভূতির কেন্দ্রে স্থাপন করতে দ্বিধা করেন নি। অরবিন্দ বলছেন- " এক অটল স্থৈর্য্য এবং নিবিড় প্রশান্তিকে দেবতার লক্ষণ বলে বর্ণনা করেছিলেন এপিকিউরাস। যে সব মুষ্টিমেয় মানুষ অবিচলিত ভাবে জীবনের স্বাদ গ্রহণ করেছেন, উপলব্ধি করেছেন তার সামগ্রিতা – তাঁরই এই দৈব ঐশ্বর্য্যে ভূষিত হয়ে থাকেন। বঙ্কিম চন্দ্র সেই বিরল পুরুষদেরই অন্যতম। ৩৭

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

ভারতের জাতীয় জীবনের এক যুগসন্ধিক্ষণের দেশ ব্রতী মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন জন্মগত শিক্ষাব্রতী। শিক্ষার মধ্য দিয়ে দেশ প্রেমের চেতনা বিস্তার করা ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ধর্ম। তিনি বলতেন " পরাধীন জাতির শিক্ষকের প্রধান কার্য্য আত্ম গৌরবের রক্ষা সাধন। জন্মগত দেশ প্রেমী রূপে তিনি বলতেন " বড় হইয়াছি মাতৃভূমির গৌরব, সম্মান, মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারি এবং দেশের কোন কাজে লাগিতে পারি, তাহা হইলে আমার জীবন সার্থক ভাবিব। " ৩৮

সাহিত্যে ছিল ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জাতীয়তাবাদ প্রচারের প্রাণবন্ত প্রবাহ। তাঁর রচিত ' সফল স্বপ্ন ', ' অঙ্গুরী বিনিময় ', ' স্বপ্ন লব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস ', ' পুষ্পাঞ্জলি ' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর জাতীয় চেতনার ও স্বদেশ ভক্তির উজ্জ্বল রত্ন। এই গ্রন্থ সমূহের মধ্য দিয়ে তিনি জাতীয়তার ভাব প্রসার করার চেষ্টা করেছিলেন। ' স্বপ্ন লব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে ' ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহারাষ্ট্রের নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় একা ও অভ্যুদয়ের বিবরণ দিয়েছেন। ' পুষ্পাঞ্জলি ' গ্রন্থে ভারতের সকল তীর্থক্ষেত্র ভ্রমণের মাধ্যমে তিনি ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত জাতীয়তাবোধকেই

অপূর্ব ভাবে প্রকাশ করেছেন। ঋষি মার্কণ্ডেয়কে ব্যাসদেব প্রশ্ন করলেন ' ইনি কোন দেবী' ? মার্কণ্ডেয় প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ব্যাসদেবকে নিয়ে তীর্থ ভ্রমণে বের হলেন। কুরুক্ষেত্র হতে দ্বারাবতী ও কন্যাকুমারিকা হতে কামাখ্যা অবধি তীর্থ দর্শন শেষে মার্কণ্ডেয় বলছেন " এক্ষণে তোমার ধ্যান প্রাপ্ত দেবীমূর্তির দর্শন প্রাপ্ত হইলে। অর্থাৎ ভারতবর্ষ অধিভারতী দেবীর ভৌতিক মূর্তি। তীর্থ দর্শনে তাঁহার পরিক্রমা করা হয়। " ভারতভূমিকে দেবী রূপে কল্পনা করা বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। এই ভাবনায় বঙ্কিম চন্দ্র প্রভাবিত হয়েছিলেন। ভূদেব রচিত " অঙ্গুরীয় বিনিময় " গ্রন্থে দেশপ্রেমের বন্যায় প্লাবিত। এক স্থানে তিনি শিবাজীর মুখ দিয়ে প্রকাশ করছেন — " জানিস না, গর্ভধারিণী মাতা, আর পয়স্বিনী গো এবং সর্বদ্রব্য প্রসবা জন্মভূমি — এই তিন সমান, যে জন্মভূমির অপকার করিতে পারে সে গো বধ এবং মাতৃহত্যাও করিতে পারে। " ' সুপ্ত লব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস ' এ তিনি হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের কথা বলে জাতীয়তাবাদের একই ধারায় উভয়কে দাঁড় করিয়েছেন। " ভারতবর্ষ যদিও হিন্দু জাতীয় দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি, যদিও হিন্দুরাই তাহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলমানেরাও আর ইহার পর নহেন, ইনি উহাদিগকেও আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালিত করিয়া আসিতেছেন। অতএব মুসলমানেরাও ইহার পালিত সন্তান। .... এক্ষণে সকলকে সম্মিলিত হইয়া মাতৃদেবীর সেবার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। " ৩৯

হেমচন্দ্র

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের নবজাগরণের চারণ কবি ছিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ছাত্র জীবন হতেই তিনি অনুভব করেন পরাধীনতার তীব্র বেদনা। ' বীরবাহু ' কাব্য গ্রন্থে তাঁর স্বদেশভক্তির দৃঢ় ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে।

" এবে সেই দেশ মান্য ভারত বর্ষেতে, ম্লেচ্ছকুল পদে দলে
লক্ষতরী ভাসাইব ম্লেচ্ছ দেশ মজাইব
বাণিজ্য করিব ছারখার।
তোর সিংহাসন পাত ম্লেচ্ছকুল ভস্মসাৎ
প্রেয়সীরে করিব উদ্ধার। "

জন্মভূমির পরাধীনতায় খেদের সাথে তিনি বলছেন ' মাগো ওমা, জন্মভূমি। আরও কত কাল তুমি। এ বয়সে পরাধীনা হয়ে কাল যাপিবে। ' ভারত বিলাপে ' ফুটে উঠেছে ব্রিটিশ বিরোধী সুর।

আগে ছিল রাণী — ধরা রাজধানী,
স্মরণে যেন গো, যাক সে কাহিনী,
এবে সে কিঙ্করী হয়েছে দুখিনী,
বলিয়ে দম্ভ করোনা গরিমা।
তোমারোত বুকে কতশত বার —
রিপু পদাঘাত করেছে প্রহার,
কালেতে না জানি কি হবে আবার
এই কথা সদা করিও ধ্যান। "

' ভারত সঙ্গীত ' হেমচন্দ্রের সব চাইতে প্রেরণা প্রদানকারী কবিতা। ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করছেন, " ভারত সঙ্গীতের দ্বারা জাতীয় আন্দোলনের পরিপুষ্টি সাধন হইয়াছে। ' বীর বাহু ' তে যে সুরের সূত্রপাত ' ভারত সঙ্গীত ' এ তাহারই পরিণতি। দেশ প্রেমের এমন উচ্ছ্বাস পূর্ণ ও উত্তেজনাময় প্রকাশ খুব কম বাঙ্গালা কবিতায় আছে। "

" হয়েছে শ্মশান এ ভারত ভূমি ,
কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি ,
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি ,
আর কি ভারত সজীব আছে ?

জপ , তপ আর যোগ আরাধনা ,
পূজা , হোম , যাগ প্রতিমা - অর্চনা ,
এ সকলে এবে কিছুই হবে না ,
তূনীর কৃপাণে করবে পূজা ।

বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে ,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে ,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে ,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে ,
ভারত কি শুধু ঘুমায়ে রবে ?

এই ' ভারত সঙ্গীত ' প্রকাশিত হওয়ার পর হেমচন্দ্রকে ইংরেজদের বিষ নজরে পড়তে হয়েছিল । হেমচন্দ্র ভবিষ্যৎ ভারতের এক উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখেছিলেন । " ফের এ ভারতবাসী । জ্ঞানের তরঙ্গে ভাসি । হাসিবে অপূর্ব হাসি লভিয়া জীবন । " জগদীশ চন্দ্রের ভগিনী লাবণ্য প্রভা সরকার বলেছেন ' গীতি কবিতায় তিনি তাঁর নির্ভিক , স্বদেশ প্রেমে অনুপ্রাণিত হৃদয়ের যে তীব্র জ্বালা প্রকাশ করিয়াছেন , তাহা আগ্নেয় গিরির অগ্নি স্রোতের মত আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে । "

নবীন চন্দ্র সেন

নবীনচন্দ্রের কাব্য রচনার মূল প্রেরণা স্রোত ছিল স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ ।

সকল প্রকার অন্যায় অবিচার ও অত্যাচার থেকে জাতির মুক্তি লাভই ছিল তাঁর কাছে একান্ত কাম্য। তাঁর কাব্য গ্রন্থ 'অবকাশ রঞ্জিনী' তে তিনি লিখেছেন —

" ভারতের ইতিহাস শোকের সাগর
কেন পড়িলাম ? আহা কেন পাইলাম
আপনার পরিচয় ? আর্য্য বংশ কীর্তি যে —
কেন দেখিলাম আহা, কেন জন্মিলাম
স্বাধীন বংশেতে মোরা, অধীন পামর ? "

'স্বায়ংচিন্তা কবিতায় স্বদেশের ভাগ্য বিপর্যয়ে বিষাদগ্রস্ত কবি খেদোক্তি করছেন —

" স্বদেশের রাজনীতি, শাসন প্রণালী,
কেবা রাজা, কিবা জাতি, কোথায় বসতি
কেমনে ভারতে পশি, দাসত্বে করিল মসি
আর্য্য - সূত - বীর্যভানু, পতঙ্গ যেমতি
ভস্মিল যবন লক্ষ্মী কি অনল জ্বালি। "

ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নবীন চন্দ্রের দেশ ভাবনার সম্পর্কে পরিপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ সমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে বলছেন " দেশের প্রতি সুগভীর ভালবাসায় তাঁর হৃদয় ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ, পরাধীনতার বেদনা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করতেন। বহু কবিতায় তিনি দেশের দুঃখ দুর্দশায় অশ্রুপাত করিয়াছেন। এই দেশ প্রীতির প্রেরণায় তাঁহার অন্তরের অন্তস্থল হইতে যে কবিতার স্রোত তরুণ বয়সেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছিল, পরিণত যৌবনে তাহাই দুকূল প্লাবী হইয়া তাঁহাকে 'পলাশীর যুদ্ধ' রচনায় প্রণোদিত করে। "

পলাশীর ঐতিহাসিক প্রান্তর দেখে কবি বেদনা মথিত হৃদয়ে লিখছেন —

" এই কি পলাশী ক্ষেত্র ? এই সে প্রাঙ্গন ?
যেই খানে মোগলের মুকুট রতন
খসিয়া পড়িল আহা, পলাশীর রণে,

যেইখানে চিররুচি স্বাধীনতা ধন
হারাইলে অবহেলে পাপাত্মা যবনে ?
দুর্বল বাঙালী আজি, মানস নয়নে,
দেখিবে সে রণক্ষেত্র ?

ভারতের গৌরবময় অতীতের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী পথের সন্ধানে তিনি সন্ধান করে ফিরেছেন। এইজন্য 'মহাভারত' এর আকরহতে 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' নামে তিনটি কাব্য রচনা করলেন। " নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণর কর্ম কান্ডের মধ্যে দেখতে পেলেন খন্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতে অখন্ড ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের বিপুল প্রয়াস। " ৪০ এই আদর্শের পথ অনুসরণ করে তিনি তাঁর কাব্য প্রকাশ করলেন —

" ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য করি সম্মিলিত
এই শৈল প্রাচীরের মধ্যে পুণ্য ভূমে
এক মহারাজ্য, প্রভু, হয় না স্থাপিতে
এক ধর্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন ? "

সাহিত্যে নবীন চন্দ্রের দেশ ভাবনা ও দেশ ভক্তির প্রাবল্য বঙ্কিম চন্দ্রকে মোহিত করেছিল। বঙ্কিম চন্দ্র মন্তব্য করেছেন, " নবীন বাবুরও যখন স্বদেশ বাৎসল্য স্রোত উদ্বেলিত হয়, তখন তিনি রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না, সে ও গৈরিক নিঃস্রাবের ন্যায়। যদি উচ্চৈঃস্বরে রোদন, যদি আন্তরিক মর্মভেদী কাতরোক্তি, যদি ভয় শূন্য তেজো ময় সত্য প্রিয়তা, যদি দুর্বাসা প্রার্থিত ক্রোধ, দেশ - বাৎসল্যের লক্ষণ হয় — তবে সেই দেশ বাৎসল্য নবীন বাবুর। " ৪১

রঙ্গলাল

ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের মূল সুর ছিল স্বদেশ

প্রেম । এই স্বদেশ প্রেম তাঁকে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্খায় উদ্দীপ্ত করেছিল । ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন " পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্যে শিক্ষিত বাঙালী আপনার চিত্তের এক গূঢ় অনুভূতিকে মূর্ত দেখিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল । " কাব্যটি প্রথম হতে শেষ অবধি দেশাত্মবোধের উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ । কাব্যের বিষয় মুসলমান কর্তৃক চিতোর আক্রান্ত হলেও কবির মনের সামনে পরিস্ফুট ছিল ব্রিটিশ শৃঙ্খলে বাঁধা পরাধীন ভারতবর্ষ ।

" মানসে করেন চিন্তা কোথায় সেদিন।
যেদিন ভারত ভূমি ছিলেন স্বাধীন ।।
অসংখ্য বীরের যিনি জন্ম প্রদায়িনী ।
কত শত দেশে রাজবিধি বিধায়িনী ।।

তাই চিতোরের স্বাধীনতা রক্ষার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা রক্ষা উজ্জ্বল আকাঙ্খা প্রকাশিত হয়েছে ।"চল যবে সমর কবির প্রান পণে । রাখিব জাতীয় ধর্ম রুধির তর্পনে । কুল ধর্ম রাখিতে জীবন যদি যায় । জীবনের সার্থকতা, ক্ষতি কিবা তায় ?"

স্বাধীনতার মাহাত্ম বর্ণনায় কবির রচনা অপরূপ ভাষা ও বাণী প্রকাশ করল –

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে
কে পরিবে পায় ?
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে
নরকের প্রায় ।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ সুখ তায় হে
স্বর্গ সুখ তায় ।

সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে
বাহুবল তার ।
আত্ম নাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে
দেশের উদ্ধার ।।

সুকুমার সেন বলছেন -- " রঙ্গলালের কাব্যের দ্বারা নিশিথিনীর মৌন যবনিকা অপসারণের প্রথম সঙ্কেত ধ্বনিত হইয়াছিল বলিয়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট্য মূল্য আছে । " রঙ্গলাল বীর রস ভাবাত্মক দেশ প্রেমের কবিতা রচনায় যে আবেগের সঞ্চার করেছিলেন জাতির জীবনে সেই দেশ প্রেম দুকুল ধরে প্লাবিত হয়েছিল ,এবং পরাধীনতার মর্ম জ্বালা তিনি জাতিকে অনুভব করতে শিখিয়ে ছিলেন । বাঙলার বহু কবি জাতীয় স্রোতে দেশ প্রেমের বন্যার ধারায় অবগাহন করেছিলেন এবং তাঁর কাছে অনুপ্রাণিতও হয়েছিলেন ।

ব্রাহ্ম আন্দোলন

" বাঙলার নবজাগরণের ইতিহাসে দ্বিতীয় সৃজনী শক্তি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর । বলিতে গেলে সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী তাহারই জীবন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত । দেবেন্দ্র নাথ দ্বারকা নাথ ঠাকুরের পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন রাম মোহনেরই মানস পুত্র, তাঁহার চিন্তা ভাবনার উত্তর সার্থক । " ৪১ রাম মোহন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'ব্রাহ্ম সমাজ' । শিক্ষিত ব্যক্তিদের উপর ব্রাহ্ম সমাজের প্রচন্ড প্রভাব ছিল । দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের পরিযত্নে ব্রাহ্ম আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল ' তত্ত্ববোধিনী সভা ', ' তত্ত্ব বোধিনী পাঠশালা ', ' তত্ত্ব বোধিনী পত্রিকা ' । স্বদেশের কল্যাণের জন্য দেবেন্দ্র নাথ রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন । তিনি ১৮৫১ সালে ' ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ' এর প্রতিষ্ঠা হলে তার

সম্পাদক নিযুক্ত হোন । মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের জীবনে ধর্মের সঙ্গে দেশ প্রীতি এক হয়ে গিয়েছিল । মহর্ষি নিজে প্রার্থনা করতেন " হে পরাত্মন , আমাদের এই বঙ্গ ভূমিকে উজ্জ্বল কর । তোমার এই সকল দুর্বল সন্তানের প্রতি কৃপা দৃষ্টি প্রদান কর । এই হীন পরাধীন দেশের কেহই সহায় নাই । ইহা নানা ক্লেষ , নানা বিপত্তিতে দিন দিন আবৃত হইতেছে — দিন রাত্রি ইহার ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হইতেছে । তুমি এ দেশকে উদ্ধার কর । "

দেবেন্দ্রনাথের রক্ষণশীল মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয় কেশব চন্দ্র সেনের কণ্ঠে । পৌত্তলিকতার সাথে সংশ্রব ত্যাগ , নারী স্বাধীনতা , মদ্য পান নিবারণ , দাক্ষিণ্য , স্ত্রী শিক্ষা ও সুলভ সাহিত্যের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন । পরে কেশব চন্দ্রের সাথে নব্য ব্রাহ্মবাদীদের মতভেদ হয় । তারা তখন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ নামে এক নতুন দল প্রতিষ্ঠা করলেন । এই নবীন দলের নেতা ছিলেন দুর্গা মোহন দাস , আনন্দ মোহন বসু , দ্বারকা নাথ গঙ্গোপাধ্যায় , শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি । এই নব্য দল 'Brahama Public Opinion' এ নিজেদের আদর্শ ব্যাখ্যা করে বললেন — " Brahmonism elevates people not only spiritually but socially, intellectually, physically and politically.. Boldly and fearlessly we hope to teach and practise reforms".

এই নব্য দলের দ্বারকা নাথের হৃদয় ছিল স্বাদেশিকতায় পরিপূর্ণ । তিনি গাইলেন —

' না জাগিলে ভারত ললনা
এ ভারত আর জাগে না জাগে না । '

শিবনাথ শাস্ত্রী বিশ্বাস করতেন স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্য মধ্যবিত্ত শ্রমিক শ্রেনীকে দেশপ্রেমের প্রবাহে যুক্তকরতে হবে । তিনি সেই বাণী শোনালেন ,

উঠ জাগো শ্রমজীবী ভাই,
উপস্থিত যুগান্তর
চলাচল নারী নর
ঘুমাবার আর বেলা নাই
উঠ জাগো ডাকিতেছি তাই।

কেশব চন্দ্রের দেশভক্তি ও আন্তর্জাতিক ভাব এক সাথে মিশে গিয়েছিল। তাঁর রচিত ভারতের প্রতি ইংল্যান্ডের কর্তব্য অভিভাষণটি ভারতের ইংরেজ শাসক সুনজরে দেখেননি। তারা এই বক্তৃতা আবৃতি করতে দেশবাসীকে নিষেধ করলেন শাস্তির ভয় দেখিয়ে। কেশবচন্দ্র ইংরেজদের এই হীনমন্যতা দেখে ঘোষণা করলেন " যদি ইংলন্ড স্থির করে থাকে যে ইংরেজ ভারতের জনগণের স্বার্থে নয়, শুধু ম্যাঞ্চেস্টার ও ইংলন্ডের বণিক সমাজের স্বার্থেই ভারত শাসন করবে, তাহলে আমি বলি, এই মুহূর্তেই বৃটিশ শাসন নিপাত যাক। " বিপিন চন্দ্র পাল সত্যই মন্তব্য করেছেন " আমাদের বর্তমান স্বাদেশিকতার হরিদ্বারে কেশব চন্দ্রকে দেখতে পাই। "

হিন্দু মেলা বা জাতীয় মেলা

১৮৬৭ সালে ' হিন্দু মেলা নামে ' এক ভাবোদ্দীপক দেশাত্মবোধ জাগরণের একটি উৎসব শুরু হয়। ব্রাহ্ম সমাজের কিছু ব্যক্তির সাথে রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর, মনমোহন ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তির প্রচেষ্টা ছিল। গগনেন্দ্র নাথ ছিলেন এই মেলার সম্পাদক। এই মেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলছেন বৎসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা। তিনি আরও বলছেন " আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম কর্মের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য, ভারত ভূমির জন্য। " ভারতবাসীকে সকল দিকে আত্ম নির্ভর করানো এই মেলার আরেক উদ্দেশ্য ছিল।

হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১২ ই এপ্রিল চৈত্র সংক্রান্তির দিন। স্থান ছিল আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়ার ডানকিন সাহেবের বাগান বাড়ী। প্রতি বছর মেলাতে স্বদেশী শিল্পের প্রদর্শনী খোলা হত। এবং নানা প্রকার ব্যায়াম ও প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত ছিল। জাতীয় ভাবমূলক ও দেশাত্ম বোধ সম্পন্ন কবিতা প্রবন্ধ প্রভৃতি পাঠ করা হতো। এই হিন্দু মেলা বা জাতীয় মেলা সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছেন " কেশব চন্দ্রের বক্তৃতা, দীনবন্ধুর নাটক, বঙ্কিম চন্দ্রের উপন্যাস, বিদ্যাভূষণের সোম প্রকাশ, মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথি, এই সকলের মধ্যে শিক্ষিত দলের মনে যেমন নব ভাব আনিয়া দিতেছিল, তেমনি আর এক কার্যের আয়োজন হইয়া নব আকাঙ্খার উদয় করিয়াছিল, তাহা নব গোপাল মিত্র মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ' জাতীয় মেলা ' ও প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা এবং দেশের সকল বিভাগের ও সকল শ্রেনীর নেতৃবৃন্দের তাহার সহিত যোগ। বঙ্গ সমাজের ইতিবৃত্তে ইহা একটি প্রধান ঘটনা, কারণ সেই যে বাঙালীর মনে জাতীয় উন্নতির স্পৃহা জাগিয়াছিল তাহা আর নিদ্রিত হয় নাই। " ৪৩

এই মেলাতেই সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুরের " মিলে সবে ভারত সন্তান " গীত হয়। " হোক ভারতের জয়। জয় ভারতের জয়। গাও ভারতের জয়। কি ভয় কি ভয়। গাও ভারতের জয়। " এই গান সম্পর্কে বঙ্কিম চন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন " এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয় কন্দরে প্রতিধ্বনিত হোক। গঙ্গা যমুনা, সিন্ধু, নর্মদা, গোদাবরী তটে, বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মারিত হউক। পূর্ব পশ্চিমে সাগরের গম্ভীর গর্জনে মন্ত্রীভূত হউক। এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয় যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক। "

এই 'হিন্দু মেলা' কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ' জাতীয় বিদ্যালয় '। এ ছাড়া সঙ্গীত চর্চা, ব্যায়াম, অশ্বারোহন, বন্দুক চালনা, চিত্রাঙ্কন, কারিগরি, জরিপ, বিজ্ঞানাদি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৮৭৪ এ নব গোপাল মিত্র নিজেই এই

মেলার সম্পাদক হন। জাতীয় ভাবনার দ্বারা তিনি এতই প্রভাবিত ছিলেন যে প্রায় সকল সংস্থার পূর্বে জাতীয় শব্দ তাঁর দ্বারা যুক্ত হতো। তিনি এর জন্য 'ন্যাশনাল নব গোপাল মিত্র' নামে পরিচিত হলেন। নব গোপাল মিত্রের এই স্বদেশী ভাবনা পরবর্তীতে খ্যাত বিপ্লবী চেতনায় গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে প্রেরণা জুগিয়েছিল।

এই 'জাতীয় মেলা'র অন্যতম প্রাণ পুরুষ ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। তিনি 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী' বা 'গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা' স্থাপনে এদেশে জাতীয়-তাবাদ উন্মেষের পক্ষে একটি বিশাল পদক্ষেপ। এই সভার কার্য্য বিবরণীতে উল্লখিত ছিল Prospectus of a society for the promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal.

রাজনারায়ণের সকল কাজের সকল চিন্তার প্রেরণা ছিল স্বদেশ প্রেম। এই স্বদেশের প্রতি চিত্ত বৃত্তির উন্মেষ দেখেই রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, " দেশের সমস্ত খর্বতা দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি গান ধরিতেন —

" এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।"

এই ভগবদ্ভক্তচির বালকেটির তেজঃপ্রদীপ্ত হাস্য মধুর জীবন, রোগে, শোকে অপরিম্লান তাঁহার পবিত্র নবীনতা আমাদের দেশের স্মৃতি ভান্ডারে সমাদরের সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই। "

এই মানুষই বিশ্বাস করতেন " ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যের মধ্যে স্বদেশের উপকার সর্বাপেক্ষা প্রধান। ' জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী'। .... ভারতবর্ষ আমাদিগের জন্মভূমি, ভারতবর্ষের উপকার সাধনে আমরা প্রাণপণে যত্ন করিব। "

একথা সত্য যে তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা ও ভাবনা দেশ প্রেমের জোয়ার এনেছিল । তাঁকে অনেকে 'grandfather of Indian Nationalism' বলে উল্লেখ করেছেন । ভাবনার দিক দিয়ে হয়তো এই উপাধি যোগ্য স্থানেই বর্ষিত হয়েছে ।

শুধু মাত্র কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয় এই হিন্দু মেলার প্রাঙ্গন থেকে উদ্দীপ্ত হয়েছিল অর্থনৈতিক পরাধীনতার বিরুদ্ধে সচেতনতা বোধ । জীবন-ভাবনার সেই মন্ত্র উদ্ভোধিত হলো মনো মোহন বসুর আক্ষেপ মূলক কবিতায় —

তাঁতি কর্মকার, করে হাহাকার
সূতা জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার —
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকো আর,
হলো দেশের কি দুর্দিন ! ....
ছুঁই, সূতা পর্যান্ত আসে ভুঁই হতে,
দীয়শালাই কাটী, তাও আসে সোতে —
প্রদীপটি জ্বালিতে, ছেতে শুতে যেতে,
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন ।

আরেক মন মোহন ঘোষ এই হিন্দু মেলার অধিবেশনে সুস্পষ্ট চেতনার বক্তব্য রাখলেন, " সারল্য আর নির্মৎসরতা আমাদের মূলধন । তদ্বিষয়ে ঐক্য নামা মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছি । সেই বীজ স্বদেশ ক্ষেত্রে রোপিত হইয়া সমুচিত যত্ন বারি এবং উপযুক্ত উৎসাহ তাপ প্রাপ্ত হইলেই একটি মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন করিবেক । এত মনোহর হইবে যে যখন জাতি গৌরব রূপ তাহার নব পত্রাবলীর মধ্যে অতি শুভ্র সৌভাগ্য পুষ্প বিকশিত হইবে, তখন তাহার শোভা ও সৌরভে ভারত ভূমি আমোদিত হইতে থাকিবে । তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না, অপর দেশের লোকেরা তাহাকে ' স্বাধীনতা ' নাম দিয়া তাহার অমৃত স্বাদ ভোগ করিয়া থাকে । "

পরবর্তীতে যে স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ বাংলা হতে ভারতবর্ষের প্রান্ত দেশে আছড়ে পড়েছিল, তার মূল স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল হিন্দু মেলার প্রাঙ্গন হতে। " ভারতের জাতীয়তাবাদের উদ্গাতা রাজনারায়ণ বসুর প্রেরণায় উদ্দীপ্ত ন্যাশনাল নব গোপাল মিত্র ১৮৭৬ সাল থেকেই স্বদেশী প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।" ' মুখার্জীস ম্যাগাজিনে ' স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে দীর্ঘ ও মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন ভোলানাথ চন্দ্র। তিনি মন্তব্য করেছিলেন " আমাদের সক্রিয় সহযোগিতাই ম্যানচেষ্টারের শ্রীবৃদ্ধির কারণ, আর তা বন্ধ করে দিলে বিদেশী শিল্পের অধঃপতন অনিবার্য্য।"

জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম

ঃ জাতীয় রাজনৈতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠার পটভূমি ঃ

রাজা রাম মোহনের প্রচেষ্টা ও কার্যকলাপ হতে ১৮৮৫ সাল ভারত ইতিহাসের পথে এক নব প্রেরণার স্রোতধারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গতিতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। কোম্পানীর শাসনের হয়েছে অবসান। ১৮৫৭ এর মহা বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ শাসন আরও দৃঢ় বদ্ধ হয়েছে। ইংরেজ শাসনের সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপ যত নগ্ন হতে শুরু করেছে জাতীয়তা বাদী আন্দোলন হয়েছে তত প্রখর। জাতীয়তাবাদী নেতৃ বৃন্দের প্রভাবে ভারতে স্বদেশ প্রেমের তথা জাতীয়তাবাদের ভমি উর্বরা হয়েছে। জাতীয়তাবাদের এই চৈতন্যের স্বরূপে প্রথম সর্বাপেক্ষা উদ্ভাসিত হয়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেনী।

উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশক হতে বাংলায় রাজনৈতিক চেতনা দ্রুত বিস্তার লাভ করছিল। এবং এই চেতনার মাধ্যমে শাসন তান্ত্রিক সংস্কার প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সভা সমিতি ও সংবাদ পত্রের মাধ্যমে জনমত সংগঠিত করার কাজ চলতে থাকে। সংবাদ পত্রে রাজনৈতিক চেতনা উন্মেষের সাথে সাথে গড়ে উঠে রাজনৈতিক সংঘ বা প্রতিষ্ঠান।

নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন তথা স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনাত্মক মনোভাবের জন্য প্রয়োজন ছিল রাজনৈতিক সংগঠনের। এই জন্য এই দশকে বহু সমিতি গড়ে উঠেছিল। বস্তুতপক্ষে ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশক ছিল 'Age of Associations'

ভারতীয় জীবন ও মননের অন্যান্য বহু ক্ষেত্রের মত রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য নিয়ম তান্ত্রিক আন্দোলনের উপযোগিতার পথও দেখান রামমোহনই প্রায়। ১৮৩৮ সালে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের চেষ্টায় জমিদার সমিতি গঠিত হয় (Land Holidies Society) জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য মূলতঃ এই সমিতি গঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই সমিতির সমাবেশ থেকেই দ্বারকানাথ ঠাকুর অনুভব করেছিলেন 'The time would soon come when his young friends, the Hindu Collegians would organise themselves into a compact band of patriots for the assertion of their political rights and their grievances". ৪৪

পরবর্তীতে ১৮৪৩ সালে থম্পসন নিজের প্রচেষ্টায় বাংলার যুব সম্প্রদায়কে দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করার জন্য গড়ে তোলেন Bengal British India Society ১৮৫৩ সালে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সনদ পাওয়ার সময় হলো। সাথে সাথে জোরদার হয়ে গড়ে উঠল রাজনৈতিক আন্দোলন। ১৮৫২ সালে গড়ে উঠল সর্বভারতীয় সংগঠন রূপে 'British India Association. এই সংগঠনের পটভূমি থেকে প্যারীচাঁদ মিত্র, রাম গোপাল ঘোষ সমস্ত চাকুরীর দরজা ভারতীয়দের খুলে দেওয়ার জন্য ও সুষ্ঠু অর্থনীতির প্রবর্তনের দাবী জানালেন। ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে শিশির কুমার ঘোষ, কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গড়ে তুললেন 'Indian League' (১৮৭৫)। পরের বছর গড়ে উঠল সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের Indian Association বা ভারত সভা। জাতীয় কংগ্রেসের আবির্ভাবের আগে ভারত সভাই

ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য জাতীয়তা বাদী সংস্থা । সুরেন্দ্রনাথ ভারত সভা গঠনের চারটি মুখ্য উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন (১) দেশে জনমত গঠন (২) এক রাজ - নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন অংশের অধিবাসীদের মধ্যে ঐক্যকে সুদৃঢ় করা (৩) হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন ও (৪) সকল আন্দোলনে জনগণের সক্রিয় সমর্থন অর্জন । এই ভারত সভার মধ্য হতে শুরু হলো I.C.S.পরীক্ষায় বয়স কমানোর বিরুদ্ধে আন্দোলন ।

" The agitation was the means, the raising of the maximum limit of age for the open competative examination and the holding of samultaneous examinations were among the ends, but underlying conceptions and the true aim and purpose of the civil service Agitation, was the awakening of a spirit of unity and solidarity among the people of Indian." ৪৫

সীমাবদ্ধ এই আন্দোলনের সূত্র ধরেই সম্ভব হলো ভারতবাসীর মধ্যে এক রাজনৈতিক ঐক্য । সারা ভারতবর্ষ তাঁর নেতৃত্বের ছত্র ছায়ায় এল । ইংরেজ রাজত্বের না হলেও ইংরেজ অবিচারের বিরুদ্ধে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে তারা একত্র হলো । "For the first time under British rule, India... had been bought upon the same platfrom for a common and united effort. Thus was it demonstrated, by an object lesson of impresive significance. That whatever might be ~~the~~ own differences in respect of race and language or social and religions institutions the people of India could combine and unite for the attainment of their common political ends". ৪৬

লর্ড রিপণের আমলে ইলবার্ট বিল বিতর্ককে কেন্দ্র করে সুরেন্দ্রনাথের আন্দোলন ভারতীয়দের রাজনৈতিক চেতনাকে আরও উদ্দীপ্ত করল । শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের বিভেদই

যে ব্রিটিশ শাসনের মূল ভিত্তি ভারতীয়দের বুঝতে দেরী হলো না । "The Ilbert Bill greately helped the cause of Indian Political advance." ৪৭

১৮৮৩ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দ মোহন বসুর পরিচালনায় ভারত - সভা প্রথম জাতীয় সম্মেলন (Indian National Conference) আহ্বান করেন কলকাতায় । বাংলার বাইরের বিভিন্ন স্থানের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন । রামতনু লাহিড়ী সভাপতিত্ব করেন । এই সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় ১৮৮৫ সালে কলকাতায় । ঠিক একই সময়ে বম্বেতে বসল উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন ।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ নিয়ে R.C.Majumder মন্তব্য করেছেন ,

'A new era in the political life of India began with the foundation of Indian National Congress towards the very end of the year 1885. For more than twenty years after that it completely, dominated the political life of India and gave a shape and form to the ideas of administrative and constitutaional reforms which formed the Chief planks in the political programme". ৪৮

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে ভারতে জেগেছিল সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক কর্ম প্রবাহ । কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা এই কর্ম প্রবাহের আনুষাঙ্গিক অঙ্গ । এই প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ইতিহাস সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গী প্রচলিত আছে । History of Indian National Congress এর লেখক সীতারামাইয়া বলেছেন "It is

shrouded in mystery as to who originated the idea of all India Congress". ৪৯)

এক সময় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন এ. সি. মজুমদার। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে ১৮৮৩ সালে কলিকাতায় জাতীয় সম্মেলনের আদর্শ থেকেই দুই বছর পরে জাতীয় কংগ্রেসের পরিকল্পনা করা হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এই জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশনের সমাপ্তি দিনের পর কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে বোম্বাই'এ। এই কংগ্রেসের সম্মেলনের উদ্যোক্তারা সুরেন্দ্রনাথের সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন। জাতীয় সম্মেলনের আদর্শই ছিল জাতীয় কংগ্রেসের অভিপ্রায়।

অনেকে অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম (Al an Octavian Hume) নামে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে সদ্য অবসর প্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারী কেই ভারতীয় কংগ্রেসের প্রকৃত উদ্যোক্তা বলে মনে করেন। তবে ভারতীয় দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদীদের আদর্শের দ্বারা হিউম মোটেই অনুপ্রাণিত ছিলেন না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। সে সময় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ ও বিপ্লবী মনোভাবের মাত্রা একেই বেড়ে চলেছিল। এই কারণে হিউম বৃটিশ সাম্রাজ্যের সংকটই অনুভব করেন এবং ভারতীয়দের অসন্তোষ প্রশমিত করার প্রয়োজন অনুভব করেন। তিনি তাঁর এক মেমোরেন্ডামে উল্লেখ করছেন "The evidence convinced me at the time about fifteen months I think before Lord Lytton left-that we were in imminent danger of a terrible out break. I was shown seven large volumes(Corresponding to a certain more of dividing the country excluding

Burma, Assam and some ~~minds~~ minor tracts) containing a vast number of entires. English abstracts or translation —— longer or shorter - of vernacular reports of communications of one kind or another, all arranged according to districts, sub-districts, sub-divisions and the cities, towns and villages included in these.... It was considered also that everywhere the small bands would begin do coalesce into large enes like drops of water on a leaf, that all the bad characters in the country would join and the very soon after the bands obtained formidable propertions a certain small number of the educated classes, ~~At~~ the time desperately, perhaps unreasonably, bitter against the government would join the movement assume here & there the lead give that - break cohesion and direct it as a National revolt". ৫০

হিউম এই পরিবেশে নিজের ভূমিকা স্পষ্ট করেই উল্লেখ করলেন "A safety valve for the escape of great and growing forces generated by our own action, was urgently needed & no more efficious safety valve than our Congress Movement could possibly he devised". ৫১

১৮৮৩ সালে হিউম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের উদ্দেশ্যে একটা খোলা পত্র, প্রকাশ করে তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক উৎকর্ষ লাভের জন্য উপদেশ দেন। তিনি এই বিষয়ে সরকারের সমর্থনের জন্যও আবেদন করেন। ফল স্বরূপ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হলো। রজণীদাম দত্ত অভিমত প্রকাশ করেছেন যে বড়লাট ডাফরিনের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র ও ব্রিটিশ পক্ষপাতিত্বের ফলশ্রুতি হলো

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা । হিউম এই ভাবে বিপ্লবকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন । ড. সুমিত সরকার এই প্রসঙ্গে বলছেন , " ভারতের নেতৃবৃন্দ অনেক আগেই এক সর্ব - ভারতীয় রাজনৈতিক সংস্থা গঠনে ব্রতী হয়েছিলেন । হিউম সেই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছিলেন মাত্র । "

(Something like a national organisation had been in the aim for quite sometime. Hume only took advantage of an already created atmosphere".) ৩২

এই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ড: অমলেশ ত্রিপাঠীর মন্তব্য " হিউমকে জাতীয় কংগ্রেসের জনক আখ্যা দেওয়া সম্ভব নয় । তাঁর ভারত প্রীতি, সংগঠন প্রতিভা , লিবারেল দল ও বড়লাটদের সঙ্গে হৃদ্যতা বিস্মৃত না হয়েও বলা যায়, তিন প্রেসিডে - ন্সিতে , বিশেষ করে বাংলায় , রাজনৈতিক চেতনা যে ভাবে অগ্রসর হচ্ছিল এবং রিপনের শাসন সংস্কারের ফলে আশায় ও ইলবার্ট বিলে পরাজয়ের ফলে হতাশায় যে ভাবে উদ্দীপিত হয়েছিল তাতে হিউম না থাকলেও কোন না কোন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হতো । হয়তো তার কেন্দ্র হত কলকাতা , কর্তা সুরেন্দ্রনাথ । বাংলা দলকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা প্রথমেই বিভেদের বীজ রোপন করতে পারত কিন্তু সুরেন্দ্র - নাথের বিচক্ষণতার ফলে তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয় । ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন কলকাতায় বসে এবং সুরেন্দ্রনাথ সদলে যোগ দেওয়ায় কংগ্রেস সত্যই জাতীয় কংগ্রেসে পরিণত হয় । ৩৩ বোম্বের গোকুল দাস তেজপাল হলে ১৮৮৫তে ডিসেম্বরে ২৭ এর অধিবেশন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গঠিত হলে সেদিন তার বিপ্লবী চরিত্র ছিল না । এই আন্দোলনাত্মক কার্যাসূচীর তীব্রতা ও উত্তেজনার জন্য কংগ্রেসকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল বঙ্গভঙ্গের কাল অবধি ।

রামকৃষ্ণ - বিবেকানন্দ আন্দোলনের পৃষ্ঠভূমি ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ সীমা । রাজনৈতিক সংগঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুত । সংঘর্ষ

শুরু । বিপ্লবী সত্তা তখনই তীব্র ভাবে জাগেনি । সমাজ স্থবির । পরাধীনতায় বিস্মৃত জাতি আত্ম সচেতন হারা । দুর্ভিক্ষ ও মহামারী মৃত্যুর ছায়া এঁকে দিয়ে যায় ভারতের ক্ষুদ্র কুটির পর্যন্ত তাদের বিভীষিকাময় আলপনা । নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বেড়াজালে রাজনৈতিক কার্যকলাপ দেশ প্রেমের স্রোতস্বিনী প্রায় লুপ্ত প্রাণা । এই সময়ই চেতনার চাবুক হাতে নিয়ে ভারতের মাটিতে বিবেকানন্দের আবির্ভাব । তেজো - দীপ্ত এই সন্ন্যাসীর দুটি রূপ । বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছেন — I have a message to the West". ভারতবর্ষ এখনও শিক্ষাগুরু । ভারতের পরাধীনতায় বিচলিত সন্ন্যাসী বিদেশকে কষাঘাত হেনেছেন । আবার দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে কষাঘাত করেছেন দেশের মানুষকে । নতুন ভাবে এক চৈতন্যময় জাতিকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন । তাঁরই চেতনায় ভারত এই শতাব্দীতে প্রথম শিখেছে জেগে ওঠার মানস যুদ্ধে । "A new spirit has arisen in the land. The long sleep of Mother India has ended and she is waking up. Who is responsible for it ? The responsibility and credit are alike the Swamijee's". ৫৪

তরুণ বিবেকানন্দ যখন প্রখর তাপে জীবন যুদ্ধে উদ্বেল তখনই আশ্রয় পেয়েছিলেন রামকৃষ্ণের স্নেহ ছায়ায় । । " দক্ষিনেশ্বরের এই আলোক সামান্য সাধকের সান্নিধ্যে থেকেও দীর্ঘ ছ বছর বিবেকানন্দ তাঁর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র অটুট রাখার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন । কিন্তু একটু একটু করে ভেঙে গিয়েছিল তাঁর সমস্ত প্রতিরোধ । অবশেষে আত্ম সমর্পনের মধ্যেই বিবেকানন্দ লাভ করলেন পরম প্রশান্তি ।" ৫৫

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে এক বিশাল দায়িত্ব দিয়েছিলেন । বিচার, বিবেক ও আদর্শের মাধ্যমে নরের মধ্যে নারায়ণকে জাগ্রত করা । কিন্তু রামকৃষ্ণের দেহ - ত্যাগের পর বিবেকানন্দ দেখলেন আসমুদ্র হিমাচল অবধি তাঁর আদর্শের শিব

নিপীড়িত, নির্য্যাতিত, পরাধীনতার গ্লানিতে শোষিত জীবের মধ্যে মৃত্যুর বেদনায় কাতরতা অনুভব করছে। বিচলিত বিবেকানন্দ ঝলসে উঠলেন।

শিকাগোর মহা সম্মেলনে দাঁড়িয়ে তিনি জগৎ বাসীকে শোনালেন হিন্দু ধর্মের অমৃত কথা, ভারত বাণীর মর্ম। উপস্থাপিত করলেন বেদান্তকে নতুনভাবে, রামকৃষ্ণ কথামৃত পরিবেশন করলেন, বিশ্বকে আবার জ্ঞানের আলোকে নিয়ে এলেন।
"He (Ramkrishna) thus represents the peculiar mission of India in the World and forms the very fountainhead of Indian Nationalism. Everyone of India's national upheavals was led by a saint & patriot in the past. What Vasistha and Viswamitra were to the Ramayana period, what Vyasa was to the Mahabharata age, what Vidyaranya was to the Vidyanagaram upheaval and what Ramdas and Tukaram were to the Mahratta rising - that Ramkrishna is to the India of today.... Ramkrishna was the final expression to that principle which Rammohan dimly foreshadowed and Dayananda eloquently recognised, and his great mission was continued and handed down to us by his far-famed disciple, Swami Vivekananda". ৫১

এই বিবেকানন্দই দেশবাসীর কাছে কি প্রচার করলেন ? দেশবাসীরা "যে একই সঙ্গে বিদেশীর পদানত ও ষড়রিপুর ক্রীতদাস। ক্ষিধের জ্বালার সঙ্গে আধ্যাত্মিক অতৃপ্তি তে কাতর জাতিভেদের লাঞ্ছনা এবং সাম্রাজ্যবাদের নিপীড়ন তাদের শতধা বিভক্ত করে রেখেছে। ভারতবর্ষের অসীম সৌভাগ্য যে প্রচারকের আত্মদৃষ্টি ও এক দেশদর্শিতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন বিবেকানন্দ।"

বিবেকানন্দ আমেরিকা ও ইংলন্ডে উদ্ধত, পরস্বলোভী, বিষয়াসক্ত, মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে ভারতের সংস্কৃতির মহনীয়তা, উদারতা অসামান্য দক্ষতায় তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু স্বদেশে ফিরেই ভারতবর্ষের নিষ্ক্রিয়তা, মানসিক ও দৈহিক জড়তা, নৈতিক সাহসের অভাব ও ভেদাভেদ জ্ঞানের ওপর বারবার তিনি চেতনার কষাঘাত করে গেছেন।

স্বাধীনতা বিবেকানন্দের জীবন সঙ্গীত। " স্বাধীনতাই উন্নতির প্রথম শর্ত। যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও কথা বলিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তেমনি তাহার আহার পোষাক বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা প্রয়োজন "। তিনি যুবকদের উদ্দেশ্য করে আরও বলছেন " পরাধীন জাতির ধর্ম নেই। তোদের এক মাত্র ধর্ম মানুষের শক্তি লাভ করে পরস্বাপহারীকে তাড়িয়ে দেওয়া। " যে দেশপ্রেম বঙ্কিমচন্দ্রের সময় ছিল কাবিক কল্পনা, বিবেকানন্দের ভাবধারায় পুষ্ট হয়ে তা লাভ করল এক সম্পূর্ণ চৈতন্য সত্তা। ভারতবর্ষের সমাজকে তিনি ভেবেছেন " আমার শৈশবের শিশু শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারানসী। " বিবেকানন্দের অভয় উক্তি " মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী, আমার ভাই। ..... ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত।" বিবেকানন্দের এই স্বদেশ প্রেম এক তীব্র আকুতির বহিঃপ্রকাশ। আর. জি. প্রধান তার India's struggle for Swaraj গ্রন্থে বলেছেন 'Swami Vivekananda might be called the father of M modern Indian Nationalism, he largely created it and also ~~xx~~ embodied in his own life it highest and noblest elements'.

অরবিন্দ বলেছেন, " বিবেকানন্দই আমাদের জাতীয় জীবনের গঠন কর্তা। তিনি ইহার প্রধান নেতা।" ভগিনী নিবেদিতা তার গুরুদেব সম্পর্কে সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন " সে সময় আমার প্রায় প্রতি প্রত্যহই তাঁহার সঙ্গে দেখা হইত। ...

ভারতের চিন্তা তাঁহার নিকট শ্বাস প্রশ্বাস স্বরূপ ছিল। যে মুহূর্তেআমি তাঁহার সহিত ভারতবর্ষে পদার্পন করিলাম, সেই মুহূর্ত হইতে তাঁহার মৃত্যুদিন পর্যন্ত আমি আমার গুরুদেবের মধ্যে আর এক অগ্নির দহন জ্বালা লক্ষ্য করিয়াছি, সে কোন তত্ত্ব, কোন আধ্যাত্মিক সত্যের উপাসনা বা উম্মাদনা নয় — দেশ ও জাতির দুর্দশা নিবারণের প্রানান্ত প্রয়াস ও তাহার নিষ্ফলতার জন্য মর্মান্তিক যাতনা ভোগ।" ৫৮

"The queen of his adoration was his motherland.' India was his day ₤ dream, India was his mightmqre'. ৫৯

সেই জন্য ভারতের সাধনা তাঁর কাছে ছিল শ্রেষ্ঠ তাই তিনি বলেছিলেন "আগামী পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া তোমরা কেবল মাত্র স্বর্গাদপী গরীয়সী জননী জন্ম ভূমির আরাধনা কর। অন্যান্য অকেজো দেবতা গণকে এই কয় বর্ষ ভুলিলেও কোন ক্ষতি নাই।" এবং এই দেশজননীর প্রতি স্বাদেশিকতার টানে, জন্মভূমির প্রতি সন্তানের ভালোবাসার টানে বিবেকানন্দ ঘোষনা করলেন "তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত।"

তাই বোধহয় "Vivekananda's religion and his patrioiism stemmed from the same impalse-desire to attain freedom from boadage, from foreign rule as well as from selfishness or sensuatity, because both are an incubses on the spirit." ৬০

ভারতবর্ষের পথ প্রান্তর এই মহা সন্ন্যাসীর অক্লান্ত পরিশ্রমে জাতীয়তাবাদ ও দেশ প্রেমের সঙ্কারে বিমুগ্ধ হলো। ভারতবর্ষের দীনতা দূর করে দীপ্ত জাতি রূপে আত্মাভিমান ভারতবাসীকে সংগ্রামী করে তুলেছিল। তাই বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলন কিংবা বিপ্লবী আন্দোলননের সময় স্বামীজীই ছিলেন প্রেরণার উৎস।

সংবাদ পত্র ও জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ

"Bengal occupies a unique position in the history of Indian journalism. It is the birth place of both the first English and the first vernacular news paper in India. It is will known that most of the important socio-religions, educational & political movements of the last century one of which evolved modern. India, first emanated from this part of the country. The story of this historic transformation is inter woven with the history of the Bengali press". (৬১)

বাংলা সাহিত্যের প্রশস্ত আঙ্গিনায় সাময়িক পত্র রূপে প্রথম আবির্ভাব হিকির 'বেঙ্গল গেজেট' ইংরাজী ভাষায় লিখিত পত্রিকা। এই পত্রিকার স্বরূপ সম্পর্কে পত্রিকায় বলা হয়েছে "a weekly political and commercial paper open to all parties but influenced by none'(No X VIII,April,1780

স্বাধীন সত্তার জন্য লড়াই করেহিকি জেলে গেলেন। পত্রিকা বন্ধ হয়েগেল। রমেশ চন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করলেন হিকি "enunciated the noble principle of the liberty of press" for which the Indians had to struggle up to the termination of the British rule in India. (৬২)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আর কিছু সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। তবে সেগুলো ছিল ক্ষণস্থায়ী। বাংলা দেশে সাময়িক পত্রের সূচনা হয় ১৮১৮ সালে। শ্রীরামপুরের

মিশনারী সম্প্রদায় ১৮১৮ সালে প্রকাশ করেন ' দিগ দর্শন ', ' সমাচার দর্পন ' । এই পত্রিকায় হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে ও সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনা করা হত । এর প্রতিরোধ কল্পে রাম মোহন রায় ও ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর প্রচেষ্টায়প্রবর্তিত হয় ১৮২১ সালে ' সম্বাদ্ কৌমুদী ' । সমাচার দর্পন সমকালীন দলিল রূপে মূল্যবান। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা গদ্যের জন্ম, হিন্দু কলেজে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন, রাম মোহনের সতীদাহ প্রথা নিরোধের প্রয়াস এবং তার ফলে হিন্দু সমাজের চাঞ্চল্য, ধর্ম সভা স্থাপন করে হিন্দু সমাজকে বাঁচাবার চেষ্টা, এবং তার ফলে সামাজিক দলাদলি, ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বহুবিধ সামাজিকঘটনায় বাঙালীর পুরনো আদর্শ যখন ভেঙে যাচ্ছিল তখন সমাচার দর্পনের মতো পত্রিকাই সব ঘটনাকে প্রতিফলিত করেছে । কিন্তু ঐ পর্যন্ত । এ পত্রিকা কোনো সমাজ সাহিত্য বা ধর্মের গঠন মূলক কোন আদর্শ দেয়নি । একদিকে এটা যেমন খ্রীষ্টান মিশনারীদের বিস্ময়কর নিরপেক্ষতার পরিচায়ক, আর এক দিকে তেমনি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্কোলের নিঃশব্দ বিপ্লবের স্মৃতি বহ । " ৬৩

এর কয়েক বৎসর পর ১৮২২ সালে প্রকাশিত হলো ' সমাচার চন্দ্রিকা ' । সম্পাদক ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । রক্ষণশীলদের ধর্মসভার মুখপত্র ছিল এই পত্রিকা । ' সমাচার চন্দ্রিকা 'য় প্রকাশিত হয়েছিল ' বাবুর উপাখ্যান ' নামে এক নকশা । যা হতে বাংলা উপন্যাসের সূচনা । বোধহয় এটিই এই পত্রিকার বিশিষ্টতা ।

" আবু কে বা - সদ খুনই জিগর দস্ত দিহদ্
বা - উমেদি - ই কেরম - এ , খাজা , বা দরবান মা খরোশ ।

এই ফার্সী বয়েতের অর্থ হলো যে সম্মান হৃদয়ের শতবিন্দু রক্তের বিনিময়ে কেনা , তাকে কোন অনুগ্রহ বা কৃপা লাভের আশায় দারোয়ানের কাছে যেন বিক্রি করোনা ।

এই বয়েতের উদ্ধৃত করে রাম মোহন রায় ১৮২৩ সালের সরকারী প্রেস আইনের প্রতিবাদে তাঁর ফার্সী পত্রিকা 'মীরাৎ উল আখবার' বন্ধ করে দেন। প্রতিবাদ ইংলন্ডের রাজার কাছেও পৌঁছে দেওয়া হয়। আধুনিক যুগের ভারতে স্বদেশ চিন্তার সূত্রপাত হয়, এই সময় থেকে।" ৬৪ এই রাম মোহনই 'ক্যালকাটা জার্ণাল' পত্রিকার স্বাধীনচেতা ইংরেজ সম্পাদক সিল্ক বাকিংহামকে নেপালবাসীদের পরাধীনতায় ব্যথিত হয়ে লিখেছিলেন — "Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be, ultimately successful".

স্বাধীনতার শত্রু ও স্বৈরাচারের মিত্র ইংরেজ শাসকরা সেদিন রাম মোহনের মুখে এই কথা শুনে শঙ্কিত হয়েছিল। তখন বাংলায় সাময়িক পত্রের জোয়ার আসেনি। কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হত মাত্র। স্বদেশ চিন্তাই হোক বা নব অভ্যুদয়ের চিন্তাই হোক তাও ভালভাবে পরিস্ফুট হয় নি, তাতেই ব্রিটিশ শাসক অনুভব করেছিল তাদের স্বার্থ হানির সম্ভাবনা। ১৮২৩ সালে কড়া প্রেস আইন জারী করা হলো। তার প্রতিবাদ ধ্বনিত হলো রাম মোনের পত্রিকার প্রকাশ বন্ধের মাধ্যমে।

এই সময় বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেনীর উদ্ভব ঘটেছে। ঠিক সেই সময় প্রকাশিত হলো নীল রতন হালদার সম্পাদিত 'বঙ্গদূত' (১৮২৯)। এই 'বঙ্গদূত' এর মতে এদেশের সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেনীর উৎপত্তি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে যুগান্তকারী। একবার যখন ঐতিহাসিক কারণের সমাবেশে মধ্যবিত্ত সমাজ শ্রেনীবদ্ধ হয়েছে, তখন অসংখ্য উপকারও তার ফলে অবশ্য দেখা দিবে। সামাজিক উপকার ছাড়াও আরও একটি সুফল ফলবে মধ্যবিত্তের আবির্ভাবে। সেই সুফলটি হল — "স্বাধীনতাও অদূরে সেই শ্রেনী প্রাপ্তা হইবেক।" এ দেশের নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেনী স্বদেশ চিন্তা ও স্বাদেশিকতা বোধের এ মোম্বেষে যে বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে 'বঙ্গদূত' পত্রিকায় তারই আভাস পাওয়া যায়। তা ছাড়া অভিনব

ভঙ্গীতে 'বঙ্গদূত' এর মধ্যবিত্ত বন্দনা থেকে এ কথাও পরিষ্কার বোঝা যায় যে বাংলা সাময়িক পত্রে স্বদেশ চিন্তার পরিপোষণে ও পরিবেশনে এই মধ্যবিত্তের ভূমিকাই হবে প্রধান ।

১৮৩১ এ প্রকাশিত হলো ' সংবাদ প্রভাকর' । যে সময় ' সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত হলো সেই সময় বাংলায় চলছে নব্য বেঙ্গলদের প্রবল আন্দোলন । তাঁর ছাত্ররা নানা রকম সভা সমিতি করে বাংলার মানুষকে অসহিষ্ণুতার বাতাবরণে উত্তপ্ত করে চলেছে । এদের ' হাতে লক, হিউম, বার্কলে, টম পেইনের বই, মুখে ইংরেজী বুলি আর ডাউন উইথ হিন্দুইজম - স্বদেশীইজম ধ্বনি ।' এই সময় ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর পত্রিকায় এই তরুণ দলের সমালোচনায় পত্রিকা পূর্ণ করে ফেলেছেন । ১৮৪০ 'Christian observer' পত্রিকা সংবাদ প্রভাকর সম্পর্কে মন্তব্য করছেন "The Prabhakar must be noticed as one of the better issues from the Native Press. Its earlier numbers contain much well managed and biting satire which its very later ones give to the public the moral essays and addresses delivered in the Tattwabodhini Sabha".
ঈশ্বর গুপ্ত সজ্ঞানে কোন আদর্শ প্রচার করেননি , কিন্তু বাংলায় রেনেসাঁস নামক যে ঐতিহাসিক পট পরিবর্তন ঘটেছিল উনিশ শতকে , সংবাদ প্রভাকরই তা প্রতিফলিত করেছিল । ৬৫ ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরের মাধ্যমে এক লেখক গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেছিলেন । এঁরা হলেন অক্ষয় কুমার দত্ত , দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর , বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় , দীনবন্ধু মিত্র , রঙ্গলাল ও মনো মোহন বসু । ঈশ্বর গুপ্তের বড় অবদান মাতৃ ভাষার জন্য প্রীতি জাগ্রত করা ।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ' ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর পত্রিকা

' জ্ঞানান্বেষণ ' প্রকাশিত হলো ১৮৩১ এ , এই পত্রিকার ভাবনার কথা পরিব্যাপ্ত হলো । "The Jnanannesan while urging on the Indians to depend upon their own industry and economy asserted that the Indians should also be allowed to share in their own government, for unless this be done, the Hindus will scarely be great as a Nation. .....According to the Jnanannesan the spread of education had another aspect as well. It was an act of noblest patriotism. On the past of an Indian and benevolence on the past of a foreigner do help the diffusion of knowledge. True to the spirit of the young Bengal movement as its peak, the Jnanannesan delighted in denouning the old institution and practices of the Hindus and pleading for progressive out look". ৬৬

১৮৪৩ সালে ' তত্ত্ববোধিনী ' পত্রিকায় একটি নির্দিষ্ট অবয়ব পাওয়া যায় । ' তত্ত্ববোধিনী সভা 'র মুখপত্র ছিল এই পত্রিকা । দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর এই পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর আত্ম জীবনীতে লিখেছেন " ইহার উদ্দেশ্য, আমাদের সমুদয় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম বিদ্যার প্রচার । উপনিষদকেই আমরা বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতাম । " তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভার গম্ভীর রচনা বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগে গদ্যের আদর্শ তৈরী করেছিল । বিদ্যাসাগর , অক্ষয় কুমার দত্ত , রাজনারায়ণ বসু , দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত উচ্চ শিক্ষিত মনীষীরা এই পত্রিকায় লিখতেন । সমকালীন সমাজ নিয়ে লেখা প্রকাশিত হলেও তবুও এই পত্রিকার লেখা সাংবাদিক ধর্মী ছিল না । মুক্তি বদ্ধ চিন্তা , মৌলিক তথ্য সন্ধান এবং সুপরিচ্ছন্ন পরিবেশনের ফলে এসব লেখার মূল্য ছিল অবিসংবাদিত ।

বঙ্গ দর্শনের পূর্বে আরও কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদিত হয়েছিল । ' বিবিধার্থ সংগ্রহ ' (১৮৫১), ও ' রহস্য সন্দর্ভ (১৮৬৩) পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় । এছাড়া দ্বারকা নাথ বিদ্যাভূষণের ' সোম প্রকাশ ' (১৮৫৮) , যোগেন্দ্র নাথ ঘোষের ' অবোধ বন্ধু ' (১৮৬০) , বিহারীলাল চক্রবর্তীর , ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত হলো প্যারী চাঁদ মিত্রের ' মাসিক পত্রিকা ' । ' সোম প্রকাশ ' এ প্রথম রাজনীতির কথা আরম্ভ হলো । ' মাসিক পত্রিকা ' প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস ' আলালের ঘরের দুলাল ' ।

১৮৭২ সালে ' বঙ্গ দর্শন ' এর আবির্ভাব একটি বড় ঘটনা । রবীন্দ্র নাথের ভাষায় ' সমাগত রাজবদুন্নত ধ্বনি । বঙ্কিম চন্দ্র এই বঙ্গ দর্শনের মধ্য দিয়ে জাতির জন্য এক মূল্যবোধ তৈরী করে দিয়েছিলেন । বঙ্গ দর্শনের ভাষায় ও দৃষ্টি ভঙ্গিতে একটা ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিবাদী চিন্তা, ইতিহাস প্রীতি , স্বদেশানুরাগ গদ্য সাহিত্যের স্পষ্ট অভিব্যক্তি ছিল বঙ্গ দর্শনের বৈশিষ্ট্য । বঙ্কিমের মানসিকতা ছিল বাঙালী সমাজকে মানব ধর্মে উজ্জীবিত করা । তাঁর চিন্তায় উদার নীতির সঙ্গে স্বদেশ স্বধর্মানুরাগের মিশ্রন ঘটেছে । স্বদেশ ও স্বধর্মকে তিনি ভালবাসতে শিখিয়েছেন । যুক্তিবাদী মন নিয়ে অন্ধতাকে তিনি দূর করাতে শেখাচ্ছেন । ইতিহাস , দর্শন , সাহিত্য মানব শাখারবিভিন্ন বিষয়কে তিনি এই বঙ্গ দর্শনের পাতায় পাতায় সমুজ্জ্বল আলোকে উপস্থাপিত করলেন । রামদাস সেন, রমেশ চন্দ্র দত্ত , রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এই ' বঙ্গ দর্শন ' ।

এর পর সাময়িক পত্রের ইতিহাসে ' ভারতী ' এক দীর্ঘজীবী পত্রিকা । ১৮৭৭ এ প্রকাশিত হয় । ১৯২৩ অবধি এ পত্রিকা সগৌরবে অধিষ্ঠান করেছিল । ' ভারতী ' র বিশেষত্ব ছিল গল্প , উপন্যাস ও কবিতা রচনায় । রবীন্দ্রনাথের যৌবনের কবিতা ওগদ্য রচনা ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছিল । ১২৯২ সালে ঠাকুর বাড়ী হতে প্রকাশিত হয়েছিল ' বালক ' পত্রিকা । সম্পাদিকা ছিলেন সত্যেন্দ্র নাথ

ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদা নন্দিনী দেবী। পরে ভারতী ও বালক এক সাথে মিশে যায়। উনিশ শতকে জোড়া সাঁকোর ঠাকুর পরিবার বাঙালী অভিজাত সংস্কৃতির আশ্রয় স্থল হয়ে উঠেছিল। বাংলা সাহিত্যে ভারতী যুগ বাঙলার এক সাহিত্যের আদর্শকে বুঝিয়েছে, যেমন বুঝিয়েছে বঙ্গ দর্শনে বঙ্কিমী যুগ। ১৮৯১ এ প্রকাশিত হলো ' সাধনা '। সম্পাদক দ্বিজেন্দ্র নাথের পুত্র সুধীন্দ্র নাথ। পরে রবীন্দ্রনাথ হোন এর সম্পাদক। ভারতীতে রবীন্দ্রনাথ অন্য লেখকদের মধ্যেএকজন ছিলেন। ' সাধনা 'তে তিনি ছিলেন একক।

সাহিত্যে প্রত্রিকার ক্ষেত্র যেমন একদিকে প্রসারিত হয়েছে, ১৮৫৭ সালে ' জাতীয় বিদ্রোহের ' পর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে বিজাতীয় ভাব মিশ্রিত কৃত্রিম জাতীয়তার অন্তঃসার শূন্য স্বরূপটি ধরা পড়েছে। এবং এর কয়েক বৎসরের মধ্যেই স্বদেশ চিন্তার ভিত্তি প্রস্তর স্বদেশের উপর স্থাপন করার আগ্রহ দেখা দিয়েছে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে। বিদ্রোহের ফলে স্থাপিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, আধুনিক শিক্ষার প্রসার বেড়েছে, শিক্ষিতদের সংখ্যা বেড়েছে, তাদের মানসিকতা তেমনি হয়েছে প্রশস্ত। স্বদেশ চিন্তার কাজে তারা আত্ম নিয়োগ করেছে। তত্ত্ব - বোধিনী পত্রিকায় এই স্বদেশ চিন্তারর কথা পরিব্যক্ত হয়েছে — " যাঁহারা এই কথা হৃদয়ের সহিত বলিতে পারেন ' জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী ' জননী এবংজন্মভূমি স্বর্গহইতেও গরীয়সী, তাঁহাদেরই যথার্থ মাতৃভক্তি, তাঁহাদেরই যথার্থ দেশানুরাগ। অতএব স্বদেশের প্রতি সামান্য অনুরাগ থাকিলেই যে দেশানুরাগ হয় তাহা নহে, স্বদেশের প্রতি বিশেষঅনুরাগই চাই। সেই বিশেষ অনুরাগই দেশানুরাগ শব্দের বাচ্য। " ৬৭ এই সময় আরও কয়েকটি সমাচার পত্র প্রকাশিত হয়েছিল যেমন সুলভ সমাচার – ১৮৭০, আনন্দ বাজার পত্রিকা সপ্তাহিক ১৮৭৮, বঙ্গবাসী ১৮৮১, সঞ্জীবনী ১৮৮৩।

বাংলা সাময়িক পত্রের গোপন রিপোর্টে (১৮৭৩ – ১৯০০) দেখা যাচ্ছে

' বঙ্গবাসী ' পত্রিকার প্রচার ছিল ২০,০০০ কপি , ' বঙ্গনিবাসী ' ৮০০০ কপি , ' সময় ' ৮০০০ কপি , ' হিতবাদী ' ৩০০০ কপি , দ্বি- সাপ্তাহিক ' বঙ্গমিত্র ' ৪০০০ কপি , মাসিক ' ভারত শ্রমজীবী ' ৪০০০ কপি । ৬৮

এই সব সাময়িক পত্রে ধ্বনিত হতো স্বদেশ ভাবনা ও স্বদেশের সমস্যা মূলক ভাবনার সুর । সুস্থ স্বদেশ প্রেমের বিকাশ ঘটাতে এই সাময়িক পত্রের দান ছিল সুমহান । বিংশ শতাব্দীর কালে প্রবেশ করা মাত্রই এই পত্রিকা গুলো গর্জে উঠল বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে । পত্রিকা গুলোর স্বাদেশিকতা দেশের অখন্ডতাকে রক্ষা করতে স্বদেশ ভাবনার ভংশীদার হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জাতীয়তাবাদের তরঙ্গে ।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম জাগরণ

ভারতে মুসলিম রাজত্ব চলেছে দীর্ঘকাল ধরে । মোঘল যুগের অবসান কালে ভারতে ঘটেছে ইংরেজ সাম্রাজ্যের সূত্রপাত । ভারতে মুসলমান সমাজ ইংরেজদের প্রথমে ভালো চোখে দেখেনি । ভারতে নবজাগরণের পাশা পাশি মুসলিম সমাজ তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছে । হুমায়ুন কবির বলছেন "Woven into the intricate pattern of Indian life, the Muslims have yet maintained their individuality. They have contributed to the symphony of Indian life and yet retained a different timbre that can be clearly recognised." ৬৯

ইংরেজ রাজত্ব কালে ইংরেজ বিরোধিতা মুসলমানদের ইংরাজী শিক্ষার পথ হতে দূরে ঠেলে রেখেছিল । ১৮১৭ এ হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হিন্দুদের যেমন শিক্ষার

ক্ষেত্রে প্রচন্ড সাড়া জাগিয়েছিল মুসলমান সমাজে সেই সাড়া তার প্রায় পঞ্চাশ বৎসরেও জাগেনি। ১৮৬৫ সালে যখন ৯ জন হিন্দু এম. এ পাশ করে সেখানে মুসলমানের সংখ্যা শূন্য। সেই সালে ৪১ জন হিন্দু বি. এ পাশ করেছিল সেখানে মুসলমান ছিল ১। আইনের ক্ষেত্রে ১৭ জনই ছিল হিন্দু। এমন কি সকল চিকিৎসা বিদ্যা সহ স্নাতক সকলেই হিন্দু। ১৮৫৮ সাল হতে ১৮৭৮ অবধি কেবল মাত্র ৫৭ জন মুসলমান স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উপাধি গ্রহন করেছিল যেখানে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ৩, ১৫৫। ৭০

দ্বাদশ জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি আর. এম. সয়ানী তাঁর সভাপতির ভাষণে খেদ প্রকাশ করে বলছেন "By a stroke of misfortune, the Musalmans had to abdicate their position and descended to the level of their Hindu fellow country men. Mean while the noble policy of the new rulers of the country introduced English Education into the country. The learning of an entirely unknown and foreign language, Of course, required hard application and industry. The Hindus were accustomed to this, as even under the Mussalman rule, they had practicals to master a foreign tongue and so easily took to the new education. But the Musalmans had not yet become accustomed of this sort of thing, and were moreover, not then in a mood to learn, much less to learn anything that required hard work and application....The result was that so far as education was concerned, the Musalmans who were once superior do the Hindus now actually became their inferiors". তিনি আরও অভিযোগ প্রকাশ করে বলেছেন —— "the political but look of the two communities was very different from the begining, English Education was the mainspring of all political evolutions of the Hindus, it is therefore hardly a matter of

surprise that the Muslim who lagged so far behind the Hindus in this respect, would fail to keep pace with them. The other circumstances also powerfully operated in the same direction, with the result that the two great communities, though subject to the foreign rule, suffering from the remedies or reforms could not present a united front in politics to meet on a common political platform. ৭৯

রাজনৈতিক দিক দিয়ে হিন্দু মুসলমানের পার্থক্য সুস্পষ্ট ভাবে দেখা দিয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলায় ফরাজী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হাজী শরিওতুল্লা ও দুদু মিঞা। ফরাজীরা ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষকে ভাবতেন 'দার - উল - হারব' শত্রুদের দেশ। এই আন্দোলন মূলত হিন্দু জমিদার, নীলকর সাহেব ও বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ছিল। এই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ (নোয়া মিয়া) তাঁর অর্থনৈতিক লক্ষ্য থেকে একে মুসলমানের ধর্মীয় সংস্কারের আন্দোলনে আবদ্ধ করে দেন। ফলে ফরাজী আন্দোলন সবিরাম ভাবে আরও কিছুকাল চললেও তার ঐক্যবদ্ধ কৃষক আন্দোলনের চরিত্রটা হারিয়ে গিয়ে বাঙালী মুসলমান সমাজের ছোট একটা দলের নিছক ইসলাম ধর্মের সংস্কারের আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। রাজনৈতিক জগতে মুসলমানদের নেতৃত্বে আর এক আন্দোলন দানা বাঁধে সেই আন্দোলন ওয়াহাবী। এর নেতা ছিলেন রায় বেরিলীর সৈয়দ আমেদ (১৭৮২ - ১৮৩১)। তাঁর বিশ্বাস ছিল ইংরাজদের জন্য ভারত

'দার - উল - হারব'। তাদের বিতাড়িত না করা পর্যন্ত ভারত 'দার - উল - ইসলামে' পরিণত হতে পারে না । এই আন্দোলন যেমন পাঞ্জাবে বিস্তারিত হয়েছিল তেমনি তিতুমীরের নেতৃত্বে বাংলায় এই আন্দোলন বিস্তৃত হয় । যদিও ধর্ম সংস্কারের আন্দোলন রূপে এর প্রারম্ভ কিন্তু সৈয়দ আহম্মদের পর কোথাও এই আন্দোলন কোথাও রাজনৈতিক, কোথাও সাম্প্রদায়িক , কোথাও শ্রেনী সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করে । কেয়ামউদ্দিন তাঁর গ্রন্থ 'The Wahabir Movement ' এ বলেছেন যে প্রথম দিকে ওয়াহাবী আন্দোলন সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন হিসাবে শুরু হলেও পরে তা রাজনৈতিক রূপ নেয় । তিনি এই আন্দোলনকে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন রূপে স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে দাবী জানিয়েছেন । এই ওয়াহাবীদের সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে 'But still the fact remained that all their proclamation were issued in the name and interest of Islam, and their appeals were only to muslim. The sympathy and support of the Hindus were never asked for and it could hardly be done without violating the basic doctrines of the movement which sought to eradicate from India all power and inluence that than Islam". ৭২

উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল মুসলমানরা সেই সব প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেনি । তাই 'Landholders Society, Bengal British India Society কিংবা British Indian Association 'এ মুসলিম সদস্য প্রায়ই ছিল না । মুসলমান সমাজ রাজনৈতিক দিক দিয়ে তৎপর হওয়ার সাথে সাথেই তাদের মধ্যেও প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রবণতা দেখা দিল । ১৮৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো মহমেডান এ্যসোসিয়েসন (Muhammadan Association) । ১৮৬৩ সালে আবদুল লতিফ কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করলেন 'Muhammadan Literary Society । উদ্দেশ্য ছিল Promoting the wall being and bringing about the political regeneration of the Indian Muslims'.

ভারতবর্ষে অন্যান্য প্রদেশের চাইতে বাংলায় মুসলমানদের শিক্ষিতের হার বেশী ছিল। ১৮৮১ - ৮২ এর একটি রিপোর্ট অনুযায়ী তাদের কলেজের ছাত্র ছিল বাংলায় - ১০৬, মাদ্রাজে - ৩০, বোম্বাই-এ — ৭, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে - ২৯, অযোধ্যা - ৭, পাঞ্জাবে - ১০। উচ্চবিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বাংলায় - ৩, ৮৩১, মাদ্রাজে - ১৭৭, বোম্বাই - ১১৮, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ - ৬৯৭ এবং পাঞ্জাবে - ৯১। ১৮৫৮ - ১৮৯৩ সালের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাশ করা স্নাতকের সংখ্যা - ২৯০, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় - ২৯, বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় - ৩০, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় - ১০২, এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় - ১০২ মুসলমান। ৭৩

এই দিক দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মুসলমান সমাজের বাংলায় অন্য প্রদেশের চাইতে অধিক প্রগতি ঘটেছিল। মুসলমান সমাজের তিনটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কলিকাতায়। "It may be held, therefore, that the Bengal Muslims took up the cause of their community before s Syed Ahmed, and anticipated, in some respects, the Aligarh Movement minus its extreme communal attitude". ৭৪

স্যার সৈয়দ আহম্মদ আলিগড় আন্দোলনকে প্রসারিত করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অনুন্নত ও অনগ্রসর মুসলিম সম্প্রদায় সাফল্য লাভ করতে পারবে না এবং যতদিন পর্যন্ত মুসলমান সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় উন্নত না হয়ে উঠছে ততদিন রাষ্ট্রের সব সুযোগ সুবিধা হিন্দুদের একচেটিয়া থাকবে। তিনি ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে প্রগতির যথার্থ সোপান বলে মনে করতেন। সেই জন্য তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি

বিস্তারে উদ্যোগী হন। তাঁরই প্রচেষ্টায় গঠিত হয় Scientific Society ও Committee for Advancement of Learning। অক্সফোর্ড ও কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে তিনি আলিগড়ে 'অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া 'তাহজিব উল আখলাক' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সৈয়দ আহম্মদের এই সব প্রচেষ্টায় মুসলিম সমাজে এক জাগরণ দেখা দেয়।

প্রথম দিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের সাহায্য করার চেষ্টা করলেও পরে আলিগড় অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ থিওডোর বেক এর প্রভাবে মুসলিম সমাজকে তিনি হিন্দুদের প্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। স্যার সৈয়দ আহম্মদ তাঁর মনোভাবনা প্রকাশ করেছেন "In a country like India where homogeanity does not exist in any case of their fields (Nationality, religion, ways of living, customs, moves, culture and historical tradition), the introduction of representative government cannot produce any benefial results, is can only result in interfering with and prosperity of the land.... The aims and objects of the Indian National Congress are based upon an ignorance of history and present day realities, they do not take into consideration that India is inhabited by different nationalities.....I consider the experiment of Indian National Congress wants to make fraught with danger and suffering for all the nationalities of India, specially for the Muslims". ১৫ (সেই জন্যই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 'Educational Congress', United Patritic Association এবং Muhhamedun Oriental Defence Association গঠিত হয়।

সৈয়দ আহম্মদ মুসলমান সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন করে তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মুসলমান সমাজকে সামগ্রিক ভাবে কংগ্রেসী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেন নি। "উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দুরা স্বদেশ প্রীতি ও স্বধর্ম প্রীতির মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। মুসলমানরা আবার স্বদেশ প্রীতি ও স্বধর্ম প্রীতিকে এমন ভাবে বিচ্ছিন্ন করেছেন যে, ধর্ম প্রীতির আতিশয্যে দেশকে তারা স্বদেশ বলে ভাবেন নি। ভারতবর্ষের বাসিন্দা হয়েও ভারতের বৃহত্তর ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে তারা নিজেদের ঐতিহ্যের সন্ধান করেছেন আরব, ইরাণ ও তুরস্কে। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের উন্মেষ কালে এই ভাবে হিন্দু মুসলমান একই ঐতিহ্যের সৌরভে অংশ গ্রহণ করতে অক্ষম হওয়ায় তা ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেনীর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিকাশে সহায়ক হয়। ৭৬

অথচ হিন্দু মুসলমান এক যোগে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করেছেন। 'সোম প্রকাশ' এর পাতায় (২১শে জানুয়ারী, ১৮৬৭) সম্পাদক লিখছেন "সারা ভারত ব্যাপী জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হলে তাতে যাতে আলিগড়ের সৈয়দ আহম্মদের দল যোগ দেন সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।" নবগোপাল মিত্রের ন্যাশনাল পেপার (১১ আগষ্ট, ১৮৭৩) মন্তব্য প্রকাশ করেছে "আমরা চাই ভারতেশ্বরীর ভারতীয় প্রজাদের দুটি প্রধান অংশ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন রকমের মনো মালিন্য না হয়।" অমৃত বাজার পত্রিকায় (২৩শে অক্টোবর, ১৮৭৩) প্রকাশিত হয়েছে "মুসলমান হিন্দুর মধ্যে সদ্ভাব ও একতা এখন দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক।" ৭৭

এই মিশ্র সামাজিক ক্রিয়া কলাপের ও রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বিধা চিত্ততার চরম সুযোগ গ্রহণ করে ইংরেজরা চাইল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করতে। ইংরেজ সরকারের সাম্প্রদায়িক বিভেদ নীতির প্রথম অমোঘ অস্ত্র হাললেন — সেই অস্ত্র বঙ্গভঙ্গ।

প্রস্তাবনা ।। উল্লেখপঞ্জী

১ । British paramountry and Indian Renaissance, Bharatiya Bidyabhavan, Vol-2, Page 1.

২ । পূর্বোক্ত – পৃঃ - ১

৩ । History of Bengal, Dacca, Vol 1 Page 598

৪ । On the Bengal Renaissance PP. - 13

৫ । রেনেসাঁস ও সমাজ মানস – অরবিন্দ পোদ্দার , পৃ : – ৪

৬ । John Addington Symonds – A short History of the Renaissance in Italy – P – 3

৭ । উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নব জাগরণ – সুশীল কুমার গুপ্ত

৮ । On the Bengal Renaissance – Susobhan Sarkar P – 13

৯ । Quoted in M Jamuna Nag's Raja Rammohan Roy , P– 26

১০ । The Father of Modern India P 4

১১ । অমলেশ ত্রিপাঠী – ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব — পৃ : ১১

১২ । রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ – শিবনাথ শাস্ত্রী — পৃ : ৬৩

১৩ । Susovan Sarkar - On the Bengal Renaissance Page - 20

১৪ । History of Native Education in Bengal/Article in Calcutta Review.

১৫ । স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা – সরহরি কবিরাজ — পৃ : ১২

১৬ । পূর্বোক্ত

১৭ । ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরম পন্থী পর্ব — পৃ : ১২

১৮ । On the Bengal Renaissance, P - 30

১৯ । ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরম পন্থী পর্ব — পৃ : ১২

২০ । পূর্বোক্ত — পৃ : ১০

২১ । রেনেসাঁস ও সমাজ মানস — পৃ : ৫৩

২২ । অক্ষয় চরিত — নকুড় চন্দ্র বিশ্বাস — পৃ : ৩৯

২৩ । অক্ষয় কুমার দত্ত — ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় উপক্রমনিকা
পৃ : — ১২৯ - ৩১

২৪ । পূর্বোক্ত — পৃ : — ১০১

২৫ । On the Bengal Renaissance, Page - 36

২৬ । উনিশ শতক : নব জাগরণ ও বাংলা উপন্যাস — ডঃ বদরুল হাসান
পৃ : — ৪

২৭ । আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত — ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২৮ । মহা বিপ্লব ও বাংলা সংবাদ পত্রের জন্মান্তর — রথীন চক্রবর্তী — পৃ : ১১

২৯ । On the Bengal Renaissance - P - 70

৩০ । স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা — পৃ : ১৮

৩১ । বাংলার ইতিহাস , দ্বিতীয় খন্ড — সুকুমার সেন — পৃ : ২১৬

৩২ । পূর্বোক্ত

৩৩ । স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা — পৃ : ১০২

৩৪ । Swami Vivekananda and Indian Nationalism - S.C. Sengupta
P - 24

৩৫ । ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব — পৃ : ২৮

৩৬ । ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পৃষ্ঠভূমি — পৃ : ১২১

৩৭ । ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব — পৃ : ২০

৩৮ । জাতীয়তার মন্ত্রগুরু যাঁরা — প্রিয়নাথ জানা — পৃ : ৬২

৩৯ । পূর্বোক্ত — পৃ : ৬৪

৪০ । উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য — শ্রীকুমার শঙ্কর সেনশাস্ত্রী —

৪১ । জাতীয়তার মন্ত্র গুরু যাঁরা — পৃ : ১০৬

৪১ (ক)। জাতীয়তার মন্ত্র গুরু যাঁরা — পৃ : ৪২

৪২ । ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের রূপরেখা — প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় — পৃ : ৪১

৪৩ । রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ — পৃ : ১৮৯

৪৪ । British Paramountry and Indian Renaissance(Vol-2)
P - 446-447

৪৫ । A Nation in Making - S.N. Banerjee

৪৬ । পূর্বোক্ত

৪৭ । History of Freedom Movement , Page - 371

৪৮ । British Paramountry and Indian Renaissance, Vol-
P -524.

৪৯ । History of Indian National Congress P- 512

৫০ । Allan Octavian Hume, Father of Indian National Congress -
Sir William Wedderburn Page -80-81,
Indian To-day R.P.Dutta - Page 313-314.

৫১ । Allan Octovian Hume P - 77

৫২ । Modern India - Sumit Sarkar Page - 89

৫৩ । স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস — প্রমলেশ ত্রিপাঠী
পৃ : ৪১ - ৪২

৫৪ । P.G. Rama Iyer, India's Debt to Swami Vivekananda(1908)
সূত্র — বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ — ষষ্ঠ খন্ড — পৃ : ৬০

৫৫ । ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরম পন্থী পর্ব — পৃ : ৩২

৫৬ । Mysore Times - March 8, 1911 সূত্র - প্রবুদ্ধ ভারত মে, ১৯১১

৫৭ । ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরম পন্থী পর্ব — পৃ : ৩৪

৫৮ । বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ — মোহিত লাল মজুমদার — পৃ : ৯০

৫৯ । চিন্তা নায়ক বিবেকানন্দ — পৃ : ২৬০

৬০ । Swami Vivekananda and Indian Nationalism. P – 72

৬১ । The Bengal Press – Samarjit Chakraborty , Preface
Cal – 1976

৬২ । History of Freedom Movement Vol– 1 Page.

৬৩ । ঊনবিংশ শতাব্দীর সম্পাদক ও সাহিত্য পত্র — ভবতোষ দত্ত
দেশ সাহিত্য সংখ্যা , ১০৯৭ — পৃ : ২৪

৬৪ । বাংলা সাময়িক পত্রে স্বদেশ চিন্তা — বিনয় ঘোষ , দেশ , ১১ । ৫ । ১৯৬৩

৬৫ । ঊনবিংশ শতাব্দীর সম্পাদক ও সাহিত্য পত্র , দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৭

৬৬ । The Bengal Press P – 64–65

৬৭ । বাংলা সাময়িক পত্রে স্বদেশ চিন্তা — পৃ : ৫৫

৬৮ । বাংলা সাময়িক পত্রে স্বদেশ চিন্তা দেশ, ১১.৫.১৯৬৩

৬৯ । Muslim Politics – Humayun Kabir Calcutta ,1969 P–1

৭০ । The British Paramountacy and Indian Renaissance
Vol - II, P -295

৭১ । পূর্বোক্ত — পৃ : ২৯৭

৭২ । পূর্বোক্ত — পৃ : ২৯৭

৭৩ । History of Political thought, B.B. Majumder
Calcutta , 1934, P-395.

৭৪ । The British Paramountacy and Indian Renaissance Vol-2,
Page - 234.

৭৫ । Syed Ahmad Khan, Akhri Madamin P - 46-50
Source of Indian Tradition P -746-7

৭৬ । ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন — বদরুদ্দীন উমর , কলিকাতা , ১৯৮৪ , পৃ : ৪১

৭৭ । রশীদ আল ফারুকী — মুসলিম মানস : সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া ,
কলকাতা , ১৯৮১ , পৃ : ভূমিকা